ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ২০২৩

মুক্তচিন্তক মাসিক পত্রিকা

প্রকাশিত

চেতনার অন্বেষণে

২৭ ফেব্রুয়ারিকে আমরা ভুলিনি!

মুজিব রহমান

যুক্তিবাদী নবধারার অভিবর্তন

মহম্মদ মহসীন

জলঙ্গী যেদিন ভোটের ইস্যু হবে

অনুজ বিশ্বাস

শিব রাত্রি পালন করা নারী জাতির কলঙ্ক নয় কি?

সৌরাষ্ট্র দাশ

দাদু কেন ধর্মত্যাগ করলো?

অশোক দাস চার্বাক

জ্যোতিষ বুজরুকি

তন্ময়

বি শে ষ সং যো জ ন:

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম

অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা

যুক্তিবাদীরা কর্তৃক প্রকাশিত একটি মুক্তচিন্তক সাময়িকী

চেতনার অন্বেষণে

| মুক্তচিন্তক মাসিক পত্রিকা
| ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ২০২২

স ম্পা দ ক
যু ক্তি বা দী রা

প রি ক ল্প না
ও
রূ পা য় ণে
মধুমিতা, অরিন্দম, অভিষেক, সৌভিক, সজল, শক্তি, উপেন, পার্থপ্রতিম
ও কিনোক্ষ্যাপা

প্র কা শ সং খ্যা
চ ব্বি শ

যো গা যো গ
yuktibadira@gmail.com
WhatsApp-9433794113
Telegram:@Yuktibadira
Fb/rationalistsmag
Insta/rationalists_mag
Twitter/yuktibadira
Website:rationalists
ক ল কা তা - ৫ ৬

বি নি ম য় মূ ল্য না ই

সূ চি

প্র ব ন্ধ - নি ব ন্ধ:

○ সম্পাদকীয় | ০৪
○ ২৭ ফেব্রুয়ারিকে আমরা ভুলিনি! - মুজিব রহমান | ১০
○ রসুনের কোষের ন্যায় ধার্মিকরাও এক বিন্দুতে আবদ্ধ - শাহাদাত হোসেন | ২৩
○ যুক্তিবাদী নবধারার অভিবর্তন - মহম্মদ মহসীন | ২৮
○ তোমার সুরে সুরে - এ ণা ক্ষী সা হা | ৩২
○ হিন্দু কোড বিল কাকে বলে? - পার্থপ্রতিম পাল | ৩৮
○ জলঙ্গী যেদিন ভোটের ইস্যু হবে - অনুজ বিশ্বাস | ৪৭
○ কোরানে আল্লাহকে কি নবি মুহাম্মদের থেকে পৃথক করা যায়? - শম্ভুনাথ চার্বাক | ৫৩
○ বিজ্ঞান মনস্কতা কাকে বলে? - রূপ্না দাস ভট্টাচার্য | ৬৪
○ বিবেকানন্দতে আছি আবার মার্ক্সবাদেও আছি! - জিষ্ণু রায়চৌধুরী | ৬৬
○ বিভেদের বীজ ও স্থাপত্য ধ্বংস: বিজেপি ও বিবেকানন্দ - তন্ময় | ৭০
○ শিব রাত্রি পালন করা নারী জাতির কলঙ্ক নয় কি? - সৌরাষ্ট্র দাশ | ৮৩
○ আস্তিক-নাস্তিক - বুবাই মান্না | ৮৯
○ প্রসঙ্গ যখন 'বিজ্ঞান শিক্ষা' ও 'বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা' - জাহিদ রুদ্র | ৯৫
○ স্কিন ক্যান্সার, সানস্ক্রিন ক্রিম প্রডাক্ট ও সান প্রটেকশন ফ্যাক্টর (SPF), একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা - প্রিন্স ফার্দিনান্দ | ১০৫
○ দাদু কেন ধর্মত্যাগ করলো? - অশোক দাস চার্বাক | ১১৮

ক বি তা:

○ ভরসা - প্রদীপ চক্রবর্তী | ১৩৮
○ থাকুক নির্ভয়ে - প্রিন্সি বেরা | ১৪০
○ বিষয় - রাজনীতি - পরিণীতা | ১৪২
○ নিখিলেশ - রাজু দত্ত | ১৪৪
○ জ্যোতিষ বুজরুকি – তন্ময় | ১৪৭

বি শে ষ সং যো জ ন

○ আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম - অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা | ১৪৯

পিডিএফ পড়ার ভালো এক্সপেরিয়েন্সের জন্য অডোবি রিডার, মুন রিডারের মত অ্যাপ ব্যবহার করুন।

যে লেখাটি পড়তে চান সূচিপত্রে সেই টাইটেলটিতে ক্লিক করুন।

প্রতিটি লেখার ওপরে সূচিপত্র বাটন পাবেন তা ক্লিক করে সূচিতে ফেরত আসতে পারবেন।

ড্রাইভ পিডিএফ ভিউয়ার অ্যাপে এই ফিচার কাজ করবে না।

মুক্তচিন্তক সম্মাননা

মুক্তচিন্তা নিয়ে বিগত সংখ্যা অবধি যাঁরা পাঁচটি বা তার অধিক লেখা দিয়েছেন, তাঁদের সম্মানজ্ঞাপক একটি সম্মাননাপত্র প্রদান করছি। পাঁচটি লেখা প্রকাশিত হওয়ার পর পত্রটি প্রদান করা হতে থাকবে আগামীতেও। যাঁদের দৃপ্ত লেখনীতে ‘চেতনার অন্বেষণে’র পাঠক ঋদ্ধ হয়ে চলেছে।

এমাসে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করছি মুক্তচিন্তক ও যুক্তিবাদী

জাহিদ রুদ্র

দিবাকর মন্ডল এবং

রাহুল রায়-কে

তাঁদের বলিষ্ঠ লেখার সাথে আমরা পরিচিত, শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই।

সম্পাদকীয়

আজ ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদযাপিত হচ্ছে সারা দেশ জুড়ে। তারমধ্যে বিজ্ঞানমনস্ক পশ্চিমবঙ্গের উদ্যোগ আলাদাভাবে বলতেই হয়। আমাদের ম্যাগাজিন আজ দুই বাংলায় ব্যাপক সমাদৃত হয়েছে। তবে পত্রিকাটিতে আরও ধৈর্য্যের সাথে পরিবর্ধন করার চেষ্টা থাকলেও তা সম্ভব হচ্ছে না এটি দ্রুত সামলে উঠতে পারব আশাকরছি। যশোর রোডের গাছ বাঁচাও আন্দোলনে সামিল হোন। এবারের কভারও তাই রাখা হয়েছে। পরেরবার কিছু গুরুত্বপূর্ণ লেখা এই সংক্রান্ত প্রকাশ করা হবে। যশোর রোডের গাছ বাঁচাও আন্দোনলের অন্যতম অগ্রণী সৌভিক মুখার্জী পোস্টে জানিয়েছেন – "আগামী ৫ মার্চ, রবিবার, ১২টা। যশোর রোড গাছ বাঁচাও কমিটির উদ্যোগে একটি জেনারেল মিটিং কল দেওয়া হচ্ছে যশোর রোড গাছ বাঁচাও কমিটির পুনর্গঠন, সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারের বিশ্লেষণ এবং গাছ বাঁচাতে পরবর্তী আন্দোলনের রূপরেখা নিয়ে আলাপ আলোচনার জন্য।

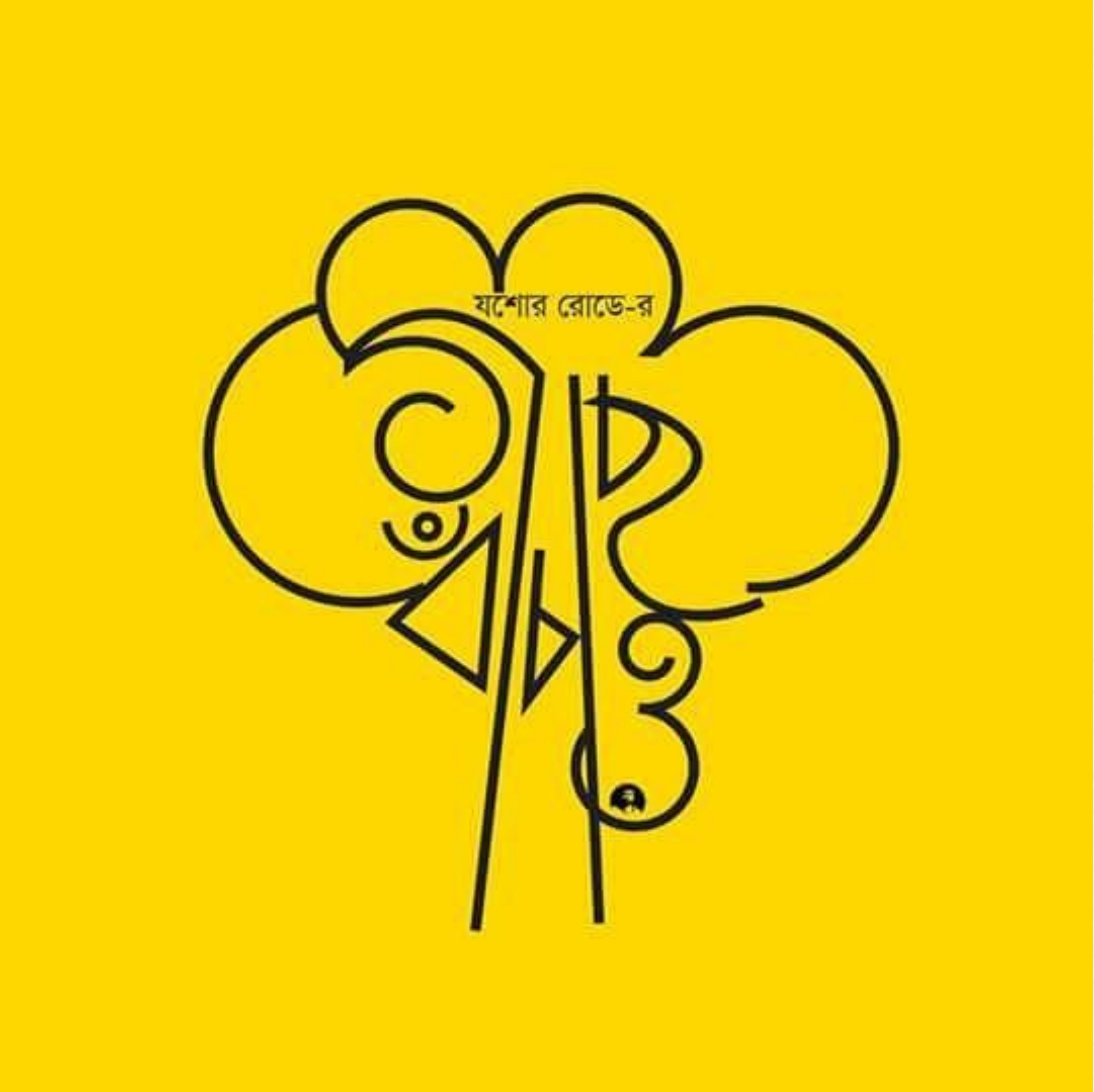
২০১৭ থেকে ধারাবাহিক গাছ বাঁচানোর দাবিতে রাস্তার আন্দোলনকে আরো শক্তিশালী করে এগিয়ে নিয়ে যেতে জি.বি মিটিংয়ে সকল সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী, পরিবেশ আন্দোলনের কর্মী, গণসংগঠন, গাছ বাঁচানোর দাবিতে সহমত প্রতিটি ব্যক্তির উপস্থিতি একান্ত কাম্য। স্থান: বারাসাত যুগল ভবন (পথনির্দেশ: বারাসাত রেল

স্টেশন ১নম্বর প্লাটফর্ম থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হাঁটা, তারকেশ্বর হোটেলের উপরে)

আপনার/সংগঠনের উপস্থিতি, পরামর্শ ও সহযোগিতা, মুনাফার চোখরাঙানি ও বাধা উপেক্ষা করে প্রাণ প্রকৃতি পরিবেশ - রক্ষার সামগ্রিক লড়াই তথা যশোর রোডের শতাব্দী প্রাচীন গাছ বাঁচানোর দাবিকে আরো শক্তিশালী করবে, কমিটির পক্ষ থেকে আমরা এই আশা রাখছি।"

আমরা যুক্তিবাদীরা এই আন্দোলনের সফলতা কামনা করছি ও পাশে আছি।

২৮, ফেব্রুয়ারি, ২০২৩



মুক্তচিন্তকদের বই ভান্ডারে আসুন -

চে ত না

অথবা টেলিগ্রামে সার্চ করুন - @Yktibadira

প্রশ্ন করুন যুক্তিবাদীদের

Ask Rationalists

আপাত অতিপ্রাকৃত ঘটনা, জ্যোতিষ শাস্ত্র, ঈশ্বর, ভূত, আত্মা, কোনও ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, সমাজ-রাজনীতি ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত উত্তরের খোঁজ করে থাকলে প্রশ্নটি যুক্তিবাদীদের বলুন।

প্রশ্নটিকে সংশিষ্ট বিশেষজ্ঞের কাছে পৌছে দেব, এবং উত্তর পাবেন 'চেতনার অন্বেষণে' পত্রিকার আগামী সংখ্যায়।

| প্রশ্ন করুন এই গুগল ফর্মে – Ask_Rationalists

এমাসের বই

Book Club by Rationalists: March - 2023

"বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো।" -রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বছরের দুটো মাস আমরা শেষ করে ফেললাম দেখতে দেখতে, আর তার সঙ্গে দুটো বইও! আগের পড়া দুটো বই ছিল বিজ্ঞান বিষয়ক। দুটো বই আমাদের কিছু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে ও প্রশ্ন গুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে শিখিয়েছে। বছরের প্রথম আমরা জেনেছি আমরা কি দিয়ে গড়া "পঞ্চভূত!" না কি ইলেকট্রন-প্রোটন ইত্যাদি দিয়ে। সেই সঙ্গে জেনেছি মহাবিশ্বের পরিচালক বল গুলোর কথা ও তাদের আচরণের কথা। ফেব্রুয়ারিতে আমরা জেনেছি পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তন ও উৎপত্তি নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর। যদি ফেব্রুয়ারির বইটা একটু বেশিই বড় হয়ে গেছিলো তাও পুরো বইটা যারা শেষ করেছেন তারা আশা করি একটা নতুন উপলব্ধির সম্মুখীন হয়েছেন। বইটি বহু প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সাথে সাথে বহু ভুল ধ্যানধারণা কে বাতিল করেছে! ফেব্রুয়ারির ২৬ তারিখ আমাদের আলোচনা সভা স্থগিত রেখে ৫ ই মার্চ তারিখ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সময় ও অন্যান্য বিবরণ

বিস্তারিত জানানো হবে তাও মোটামুটি রবিবার সন্ধ্যে ৮-টায় অনলাইন মিটিং এ আবার দেখা হবে।

ফেব্রুয়ারিতে সকলকে একটা ভারিক্কি বই পড়তে দেওয়ার খেসারৎ হিসাবে এই মাসের অর্থাৎ মার্চের জন্য আমরা একটা অপেক্ষাকৃত পাতলা বই বেছে নেবো পড়ার জন্য। এত সহজে আমরা বিজ্ঞানের পড়া থেকে মুক্তি পাচ্ছি না। এই মাসের বই বিজ্ঞানের ইতিহাস বিষয়ক। স্কুল জীবনে আমরা অনেকেই ইতিহাসে পাতিহাঁস চড়িয়েছি আবার বা কেউ বিজ্ঞানে অজ্ঞান হয়েছি। যদিও আগের মাসের বইটি সত্যিই অজ্ঞান করার মতো ছিল (অনেক ভারিক্কি বৈজ্ঞানিক শব্দের জন্য)। কিন্ত যাই হোক এই মাসের বই পাতিহাঁস চড়াবে না আবার অজ্ঞান ও করবে না। বরং প্রাচীন ভারতের প্রকৃত বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে আলোকপাত করবে। পরিচয় করবে প্রাচীন ভারতের গর্বের কিছু অধ্যায়ঃ এর সাথে। আবার তার সাথে বর্তমানে প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে যে অপপ্রচার ও কল্পনাত্মক অপবিজ্ঞানের প্রসার প্রচার চলছে তা নিয়ে ও থাকবে বিস্তারিত আলোচনা।

তাহলে এই মার্চ মাসের বই হিসাবে আমরা পড়বো ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি থেকে প্রকাশিত “প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান: বাস্তব বনাম কল্পনা ” বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০টির মতো ও মূল্য পঞ্চাশ টাকা। সকালের পড়ার ও সংগ্রহে রাখার মতো একটি বই। যাইহোক সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বইটিকে

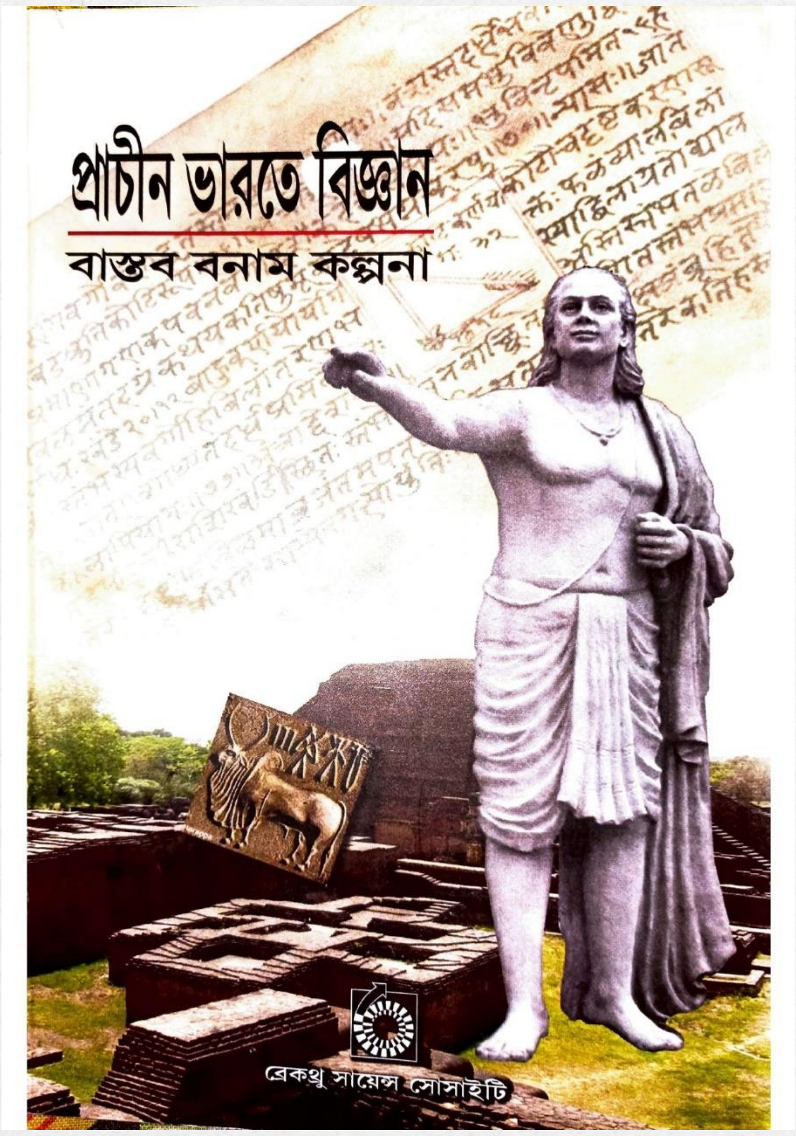
নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা এপ্রিলের ২ তারিখ আবার আলোচনায় মিলিত হতে পারবো। তত দিন সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, বই পড়ুন, পড়ান ও মুক্ত চিন্তা ভাবনার চর্চা কে এগিয়ে নিয়ে চলুন।

বুক অফ জানুয়ারি: "কি দিয়ে সমস্ত কিছু গড়া" অধ্যাপক পলাশ বরণ পাল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বুক অফ ফেব্রুয়ারি: “বিবর্তনের পথ ধরে” বন্যা আহমেদ, অবসর প্রকাশন ঢাকা

“একটি বই পড়ার দুটি উদ্দেশ্য থাকা উচিত একটি হল- বইটিকে উপভোগ করা অন্যটি হল- বইটি নিয়ে গর্ব করতে পারা।”- বার্ট্রান্ড রাসেল

এমাসের বইটির লিংক (টেলিগ্রামেই পাবেন) -link



সূচিপত্র

২৭ ফেব্রুয়ারিকে আমরা ভুলিনি!

লি খে ছে ন – মু জি ব র হ মা ন



২০০৪ সালের বই মেলার একটি বিষয় হুমায়ুন আজাদ লক্ষ্য করেন এবং আগামী প্রকাশনীর স্বত্তাধিকারী ওসমান গণিকে জিজ্ঞাসা করেন, মৌলবীরা এবারের মেলায় আমাদের স্টলে এতো ভিড় করছে কেনো? বিষয়টি তাঁর চোখে পড়েছিল মেলার শুরু থেকেই। ইউনিভার্সিটিতে তার রুমে শুকনো হাড় পেয়েছিলেন বইমেলা চলাকালেই। তখন ওটাকে খুব গুরুত্ব দেননি। আসলে এটা ছিল সিম্বলিক। কিন্তু তাকে হত্যা করার উদ্যোগ নেয়া হতে পারে এটা কখনো ভাবেননি। ২৭ ফেব্রুয়ারী ০৪ হুমায়ুন আজাদ অন্য দিনের মতো বইমেলার আগামীর স্টলে

বসেছিলেন। স্টল থেকে তিনি বের হন সম্ভবত রাত ৯টার দিকে। তারপর হাঁটেন, কয়েকজনের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন। লেখক চত্বরে রফিক আজাদ ও মোহন রায়হানসহ কয়েকজন লেখক ছিলেন। তাঁরা তাঁকে বসতে বলেন। তিনি তাঁদের সঙ্গে বসেন, একটু সিগারেট খান। সেখানে ছবি তোলা হয়। তারপর আমি যাব বলে বের হয়ে বাংলা একাডেমির সামনের রাস্তাটি পার হওয়ার চেষ্টা করেন। এরপর তাঁর কিছু মনে নেই।

আক্রমন করেই ঘাতকরা বোমা ফাটিয়ে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান দিয়ে পালিয়ে যায়। প্রথমে তাকে পুলিশ ও উৎসাহী জনতা ঘিরে রাখে। উপুর হয়ে থাকায় কেউ চিনতে পারেনি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের সদস্য হাসান শরীফ মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে থাকা রক্তাক্ত হুমায়ুন আজাদকে তোলেন। তিনি চিনতে পারেন হুমায়ুন আজাদকে। রক্তে ভেজা মুখ দেখে চিৎকার করে উঠেন। স্যারের এক পাশের গাল দুই ভাগ হয়ে দুদিকে চলে গিয়েছিল। পুরো মুখটা হা হয়েছিল। তিনি দু'পাশে চাপ দিয়ে জোড়া লাগানোর চেষ্টা করেন। তারা হাসপাতালে নেওয়ার জন্য রিক্সায় উঠানোর চেষ্টা করেন। সম্ভব না হওয়াতে গাড়ির চেষ্টা করেন। কেউ রাজি হয়নি। এরপর পুলিশের ট্রাকে করেই তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। ট্রাকে উঠানোর আগে হাসান শরীফের সিনিয়র বন্ধু জনাব বিটু ট্রাকে ওঠেন। ওঠানোর আগে সাংবাদিক জনাব

পাভেল ছবি তোলেন। সেই ছবিই পরদিন পত্রিকায় আসে। হুমায়ুন আজাদের পাশেই ছিলেন হাসান শরীফ; পত্রিকায় তার ছবিও আসে। এ নিয়ে তিনি ভোগান্তির মধ্যেও পড়েন। ট্রাকে ওঠালে স্যার জিজ্ঞাসা করেন, বাবা আমাকে কই নিয়ে যাও? হাসান শরীফ বলেন, হাসপাতালে। স্যার বলেন, আমার চশমা কই? হাসান শরীফ বলে, স্যার আছে। স্যার বলে, আমি পুলিশের গাড়িতে যাব না। হাসান শরীফ বলেন, ঠিক আছে স্যার আমরা নেমে যাব এখুনি। হাসান শরীফ তার ব্লগে লিখেছেন, আহত রক্তাক্ত অবস্থায় আমি কোনও মানুষকে এত শক্ত থাকতে দেখিনি। অন্য কেউ হলে এত ব্যাথা নিয়ে চিৎকার করত। ভয় পেত, কিন্তু স্যার খুব শক্ত দৃঢ় চিত্তে বসে আছেন যেন কেউ কোনও ভুল করেছে। কেউ যেন ভুল করে তাকে কুপিয়ে গেছে। ট্রাক ঢাকা মেডিকেল কলেজের জরুরী বিভাগের সামনে গিয়ে থামে। তারা স্যারকে জরুরী বিভাগে নিয়ে গেলেন। আক্রান্ত হওয়ার পরে পার হয়েছে মাত্র ১১ মিনিট। তারা ৫ টাকা দিয়ে স্লিপ কাটলেন। ওয়ার্ডে নিয়ে গেলে চিকিৎসক স্লিপ চাইলেন। সেটা ততক্ষণে রক্তে ভিজে গিয়েছিল। ডাক্তার আবারও স্লিপ আনতে বললে তারা আবারও স্লিপ আনেন। শুরু হয় হুমায়ুন আজাদের চিকিৎসা।

হুমায়ুন আজাদের তারপরও যা মনে পড়েছে তা হল তিনি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। তাঁর মেয়ে স্মিতা

আজাদকে দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা এখানে এলে কী করে? তার আগে তাঁর পকেট থেকে মোবাইল, মানিব্যাগ ও হাতঘড়ি তাকে দেন। এরপর আর কিছু তাঁর মনে নেই। পরে যখন তিনি জেগে উঠেন তখন ৩ মার্চ। মাঝখানের সময় তাঁর কিছু মনে নেই। বইমেলা থেকে বের হওয়ার পর তাঁর সম্ভবত তখন খুবই প্রস্রাবের প্রয়োজন হয়েছিল। বাংলা একাডেমিতে লেখকদের জন্য এর আলাদা কোনও ব্যবস্থা নেই বলে সম্ভবত রাস্তা পেরিয়ে ওই পাশে গিয়ে প্রস্রাব করেন। তারপরে পূর্ব দিকের ফুটপাত ধরে তিনি এগোতে থাকেন। সম্ভবত যখন তিনি অটোমিক এনার্জির বিপরীত দিকে আসেন তখন মৌলবাদী অপশক্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী শায়খ আঃ রহমানের ছোট ভাই আতাউর রহমান সানীর নেতৃত্বে কয়েকজন উগ্র মৌলবাদী তাঁকে আক্রমণ করে। কিন্তু এসব কিছুই তাঁর মনে নেই। এ অংশে তিনি সম্পূর্ণ স্মৃতিভ্রষ্ট। তাঁর তখন মনে পড়েছিল যে, তিনি চিৎকার শুনছেন ছাত্রদের, তারা বলছে: হুমায়ুন আজাদ- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর- পুলিশ; তিনি বুঝতে পারছিলেন যে, তাঁকে একটি কাটা পাঙ্গাস মাছের মতো টেনে পুলিশের গাড়িতে তোলা হচ্ছে।

তিনি আক্রান্ত হওয়ার পরে সুস্থ হওয়ার পরেও ঐ দৃশ্যের কথা মনে করতে পারেননি। যারা তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল তারা তাকে প্রথমে গলার দিক থেকে কেটে ফেলতে চেয়েছিল; না-পেরে তারা মুখের উপর ঘা

দিয়েছিল, এবং তারপরেও না-পেরে হয়তো মাথায় ঘা দিয়েছে এবং তিনি তো অদম্য মানুষ— সেজন্যই হয়তো তারা সম্পূর্ণ সফল হতে পারেনি; এবং খুব অবাক ব্যাপার যে, তার হাত কাটেনি কিন্তু বাহুর অংশ কেটেছে। বই মেলা থেকে ফেরার সময় প্রতিদিন দুটো করে বই নিয়ে আসতেন। তিনি হয়তো সেই বই নিয়ে ফিরছিলেন, ফলে তাঁর হাত কাটেনি কিন্তু বাহুতে তারা আক্রমণ করতে পেরেছে। পত্রিকায় যে ছবি প্রকাশিত হয়েছে রক্তাক্ত; ঝরঝর করে তাঁর মুখমন্ডল থেকে রক্ত পড়ছে এবং নিজের চিবুক নিজে চেপে ধরে আছেন: তিনি তখন হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর চিবুক-মুখমন্ডল শরীর থেকে খসে পড়ছে।

দ্রুতই খবর রটে যায়। আগামী প্রকাশনীর সত্তাধিকারী ওসমান গণি খবর পেয়ে হুমায়ুন আজাদের স্ত্রীকে খবর দেন। সেখান থেকে খবর পান আরেক ভাই সাজ্জাদ কবীর বাদল। তাঁর কাছ থেকে খবর পান ছোট ভাই মঞ্জুর কবীর মাতিন। তবে কি ঘটেছে তখনো তাদের কাছে ছিল অজানা। ছোট ভাই জেনেছে তিনি বই মেলায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তিনি রিক্সা নিয়ে মোহাম্মদপুরে তার ঔষধের দোকান থেকে ওদিকেই যাচ্ছিলেন। কাঁটাবন এলাকায় এসে খবর পান ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে নেওয়া হয়েছে। সেখানে চিকিৎসা করছে। হুমায়ুন আজাদের স্ত্রী, দুই কন্যা ও পুত্র ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পৌঁছান।

ডাক্তার ঔষধের একটি ফর্দ ধরিয়ে দেয় তাঁর বড় মেয়ে মৌলির হাতে। সেটা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুটতে থাকেন ঔষধের সন্ধানে। সামনে দেখতে পান ছোট কাকা মাতিনকে। তিনি কয়েক দোকান খুঁজে ঔষধ কেনার সময় লোকজনের কথাবার্তায় বুঝতে পারেন হুমায়ুন আজাদকে কোপানো হয়েছে। দ্রুত ফিরতেই দেখেন অ্যাম্বুলেন্স হুমায়ুন আজাদকে নিয়ে যাচ্ছে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালের দিকে। হুমায়ুন আজাদের স্ত্রী লতিফা কহিনুর তাকে ঐ অ্যাম্বুলেন্সে উঠে পড়তে বলেন। একই অ্যাম্বুলেন্সে উঠেন হুমায়ুন আজাদের ফোলার রোডের বাসার দাড়োয়ান। মাতিন নিজের কোলে আজাদকে শুইয়ে দেন। তিনি কথা বলতে থাকেন। তাঁর স্ত্রী সন্তানদের কথা জিজ্ঞাসা করেন। একসময় তিনি মাথার নিচে দেয়ার জন্য একটি বালিশ চান। দাড়োয়ান তাঁর মোটা শার্টটি খুলে দেয়। হুমায়ুন আজাদের মাথার ব্যান্ডেজ ভিজে রক্ত ঝরতে থাকে। তাঁর মুখ দিয়েও রক্ত বের হচ্ছিল। ডাক্তার মাতিনকে হাত দিয়ে রক্ত মুখ থেকে বের করে দিতে বলেন, যাতে রক্ত মুখের ভিতরে না যায়। তিনি তাই করতে থাকেন। জাহাঙ্গীর গেইট পর্যন্ত হুমায়ুন আজাদের জ্ঞান থাকে। এর পর তিনি জ্ঞান হারান।

সিএমএইচে ডাক্তাররা রক্ত চান রক্তের গ্রুপ ‘ও’ পজেটিভ। রক্ত দেওয়ার জন্য হাজার হাজার মানুষ সম্মতি জানায়। এমনকি গার্মেন্টস শ্রমিক, রিক্সা চালকরাও রক্ত

দিতে চান। রাত জেগে থাকেন পরিবারের লোকেরা। তারা ভয়ে থাকেন ও আশঙ্কা প্রকাশ করেন রাতে হুমায়ুন আজাদের লাশ সরিয়ে ফেলতে পারে কর্তৃপক্ষ। ডাক্তাররা জানান ঔষধপত্র কিনে আনতে হবে নিজেদের। পরে একসাথে বিল পরিশোধ করবেন। পরদিন তাদের জানানো হয়, বিল সরকার দেবে। হুমায়ুন আজাদের বড় বোনের বড় ছেলে পিজির সার্জন। তিনি অনুমতি নিয়ে ওটিতে থাকেন। তার কাছ থেকে খবর পেতে থাকেন পরিবারের সদস্যরা। তিনি আশ্বস্ত করেন হুমায়ুন আজাদ সুস্থ হয়ে উঠছেন। দীর্ঘ-অপারেশন শুরু হয়। ভোর রাতের দিকে অপারেশন শেষ হয়। বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যে জানা যাবে তিনি বেঁচে উঠবেন কি না। পরিবারের সদস্যদের দীর্ঘতম রাতটি অতিবাহিত হয় হাসপাতালে।

তাঁর আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রচারের সাথে সাথেই তাঁর অনুরাগী ও মুক্তচিন্তার মানুষেরা উদ্বেলিত হয়ে পড়েন। তারা আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের উপর ব্যাপক চাপ প্রদান করেন। সরকার বাধ্য হয় তার সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। পরদিন ভারতীয় টিভি চ্যানেল ‘তারা বাংলা’ একটি ভুল খবর প্রচার করে যে, ড. হুমায়ুন আজাদ মৃত্যুবরণ করেছেন। খবরটি মুহূর্তের মধ্যেই দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। আবার বাংলাদেশের মিডিয়া সঠিক সংবাদ পরিবেশন করায় বিভ্রান্তি কেটেও যায়।

তাঁকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে এনেছে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতাল, কিন্তু সেখানে তাঁর দেহটিকে নানাভাবে বিকৃত করা হয়েছে- তাঁর মুখমণ্ডলে কোনো দাঁত ছিল না, ঠিক মতো খেতে পারতেন না, এবং তার শরীরের ভেতরে আরও অনেক ব্যধি এই আক্রমণের ফলে জন্ম নিয়েছিল। তাঁর বাঁদিকের যে স্নায়ু রয়েছে সেগুলো নিস্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল, সেগুলো তাঁর মাংসকে এবং অন্যান্য জিনিসকে টানত না; ফলে তাঁর মুখটি বাঁকা হয়ে গিয়েছিল। তিনি উপরের দিকে তাকাতে পারতেন না- মাথা ঘুরতে থাকত- বালিশে শুতে গেলে মাথা ঘুরতো, মাথা তুলতে গেলেও মাথা ঘুরত। খুব স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারতেন না। সামরিক হাসপাতাল তাঁর চিবুকের ভিতরে ধাতব পাত ঢুকিয়ে দিয়ে এটাকে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করেছে, তাঁর মুখের ভেতরে তারা তিনটির মতো স্ক্রু লাগিয়েছিল জোড়া দেওয়ার জন্য; মাথায় অন্তত ৫০ টি সেলাই ছিল। তাঁর ঘাড়ের পেছনে একটি বেশ বড় গভীর ক্ষত ছিল। জীবন তো তাঁর ফিরে পেয়েছিলেন কিন্তু অনেক সমস্যা রয়ে গিয়েছিল। তাঁর বাঁ চোখ দিয়ে সব সময় পানি ঝরতো। তাঁর বাঁ দিকের দুপাটি দাঁতই পড়ে গিয়েছিল। স্থায়ীভাবে দাঁত বাঁধানোর জন্য এক বছর লাগত, কিংবা খোলা ও লাগানো যায় এমন দাঁতের জন্য লাগত চার মাস। বা গালে সিএমএইচ এ যে তিনটি অস্ত্রোপাচার হয়েছে তার তিনটির গভীর দাগ রয়েছিল। সেগুলো ৬ মাসের আগে অস্ত্রোপাচার করা সম্ভব ছিল না।

হুমায়ুন আজাদকে ব্যাংককের বুমরুনগ্রাদ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় ২২ মার্চ ০৪ তারিখে। সাথে যান আগামী প্রকাশনীর স্বত্তাধিকারী ওসমান গণি এবং হুমায়ুন আজাদের ছোট ভাই মঞ্জুর কবীর মাতিন। কয়েকদিন পরে ওসমান গণি ফিরে আসেন দেশে। মাতিন থাকেন শেষ পর্যন্ত। সিএমএইচ তাঁকে বাঁচিয়ে তুললেও তিনি অধিকতর সুস্থ হয়ে উঠেন বুমরুনগ্রাদ হাসপাতালে। সেখানকার ডাক্তার, নার্স তাঁর বিশেষ যত্ন নিয়েছে। তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেন। এরপরেও তাঁর গালে বড় গভীর দাগ সেসব ঠিক করতে হলে তাঁকে ছয় মাস পরে আবার যেতে হত ব্যাংকক। তারপরে রয়েছে প্লাস্টিক সার্জারী। ব্যাংকক থেকে দাঁত লাগাতে অনেক খরচের কথা চিন্তা করে পরবর্তীতে ঢাকাতেই নিজস্ব চিকিৎসকের কাছ থেকে দাঁত বাঁধান।

ব্যাংকক থেকে ২০ এপ্রিল ০৪ দেশে ফেরার পরে মানবাধিকার ও লেখকের স্বাধীনতা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বলেন, আমি ছেলেবেলায় একটি বাংলা ব্যাকরণ পড়েছি। সেখানে গোপাল নামে একটি অসাধারণ চরিত্র ছিল। সেই ব্যাকরণটি জানিয়েছে, গোপাল কলা খায়। গোপাল অন্য কিছু খায় না, শুধু কলা খায়। সুশীল বলার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বুঝি একটি দুর্বল মানুষ। ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত। সুন্দর ইস্ত্রি করা পোশাক পরে, মাথায় প্রচুর পরিমাণে তেল দেয়

এবং মাঝখানে সিঁথি কাটে- এই ধরনের একটি মানুষ। এই সুশীল সমাজকে দিয়ে আসলে কোনও কাজ হবে না। আমাদের জন্য আসলে অশীল সমাজ প্রয়োজন। যে অশীল সমাজ চিরকাল সমাজকে রূপান্তরিত করেছে, যে শব্দগুচ্ছের বাংলা অনুবাদ সুশীল সমাজ তা হচ্ছে সিভিল সোসাইটি। বাংলাদেশে এর একটি সর্বজনগ্রাহ্য বাংলা রূপ থাকা দরকার। সামরিক সমাজের বিপরীত হচ্ছে সিভিল সমাজ। আমি এক্ষেত্রে যে বাংলা শব্দটি প্রস্তাব করতে চাই তা হতে পারে জনসমাজ। বাংলাদেশে মানবাধিকার আছে কি না সেটা বোধ হয় খুব বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন পড়ে না। একটি বাক্য যথেষ্ট যে, বাংলাদেশে মানবাধিকার নেই। দেশে ফিরে পূর্বের মতোই সাহসী ছিলেন।

'মৃত্যু থেকে কয়েক সেকেণ্ড দূরে' নামে বই লেখা বিষয়ে পত্রিকায় সংবাদ বের হলে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন, বইটির নাম হবে 'মৃত্যু থেকে এক সেকেন্ড দূরে'। তিনি বলেছিলেন, মে মাসের মাঝামাঝি আমি আবার লিখতে শুরু করবো। বিষয়বস্তু হবে আমার মৃত্যু অভিজ্ঞতা। জীবনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। মৃত্যু হচ্ছে অভিজ্ঞতাহীন একটি ব্যাপার। হামলাকারীদের শাস্তির ব্যাপারে বলেছেন, আমি বিন্দুমাত্র আশাবাদী নই। কারণ বাংলাদেশ অপরাধীদের চিহ্নিত করা হয় না। সাঈদীকে ধরতে হবে, মৌলবাদীদের ধরতে হবে তারাই আসলে আমার খুনি।

জুলাই মাসের ২ তারিখ; আক্রান্ত হওয়ার পরে প্রথমবার এবং শেষবার নিজ গ্রামে আসেন। তাঁকে প্রথমে বিক্রমপুরের ভাগ্যকুলের তরুণ অনুরাগীদের পক্ষ থেকে এবং বিকেলে 'আমরা রাড়িখাল বাসী'র পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেয়া হয়। তিনি তাঁর অনুরাগীদের প্রথা ভাঙ্গার আহবান জানান। এখানেও বোঝা যায় আক্রমণ তাকে শারীরিকভাবে কাবু করলেও মানসিকভাবে তিনি ছিলেন আগের হুমায়ুন আজাদ। এরপর শুধু সমাধিস্থ হতে রাড়িখাল আসেন। চিরনিদ্রায় শায়িত আছে পৈতৃক ভিটায়। বর্তমানে পাক সাদ জমিন সাদবাদ উপন্যাসের প্রচ্ছদ আঁকা হয়েছে সমাধিতে, যা জ্যোতির্ময় আঙিনা নামে পরিচিত।

২৪ জুলাই তাঁর একমাত্র পুত্র অনন্য আজাদকে অপহরণের চেষ্টা করে ঘাতকেরা, ২৫ জুলাই বিকালে টেলিফোনে বোমার ভয় দেখিয়ে তাদের আতঙ্কিত করে তোলে। এর প্রেক্ষিতে ২৮ জুলাই ০৪ বিভিন্ন পত্রিকার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী ও দেশবাসীর কাছে খোলা চিঠি লেখেন। শেষ করেন এভাবে, প্রিয় প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী ও দেশবাসী, এ সঙ্কট মুহূর্তে, বিপন্নতার সময়ে আমার পরিবারের ও আমার জীবন আমি আপনাদের হাতে সমর্পণ করলাম; আপনারাই স্থির করবেন বাংলাদেশের রক্তের বন্যায় কি বিনিদ্র কাঁপতে থাকবো, এবং বিশ্ব শিউরে উঠবে বাংলাদেশকে দেখে, সময় বেশি নেই,

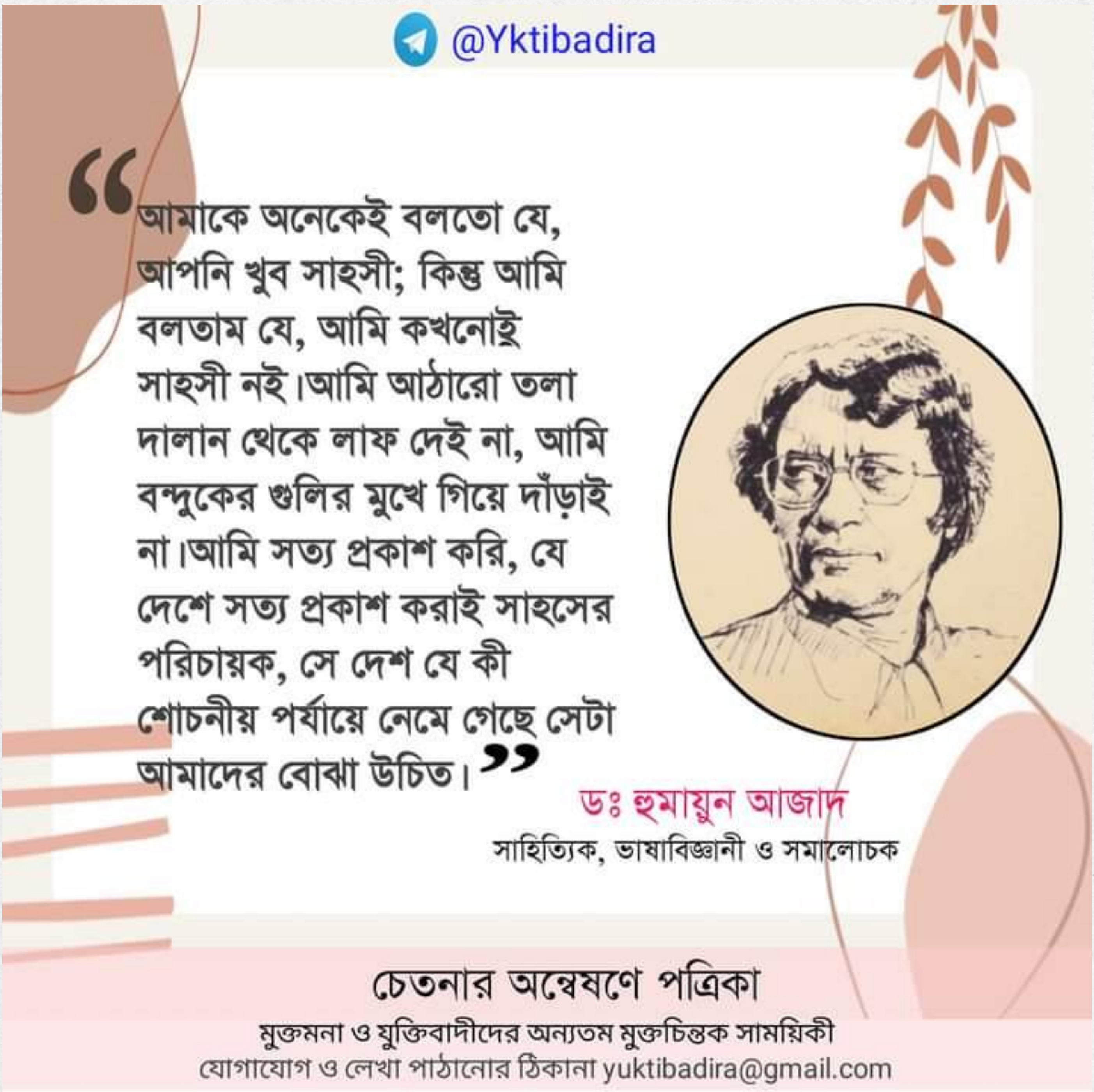
এখনই আপনাদের কর্তব্য স্থির করার জন্য আবেদন জানাই।

তিনি ব্যাংকক থেকে ফিরে বলেছিলেন, আমি লিখবো, লেখাই হচ্ছে আমার জীবন, লেখাই হচ্ছে আমার আনন্দ। আমি যদি আরও ৩০ বছর বেঁচে থাকি, এবং তাহলে হয়তো আরো অন্তত ৬০ টি বই লিখবো, এবং এগুলো বিচিত্র ধরনের হবে; তাতে বক্তব্য বা কাহিনী বা আবেগ বহুরূপে প্রকাশ পাবে এবং সেগুলো বাঙালিকে বিকশিত করবে। আমার কাজ কল্যাণে এসেছে, এবং আরো বহু বছর কল্যাণে আসবে।

তিনি তাঁর নিজ ভাষা এবং দেশকেই প্রচণ্ডভাবে ভালবাসাতেন। তিনি উদ্বাস্তু হয়ে দেশে দেশে ঘুরতে চাননি। তিনি বলেছিলেন, আমি চাই না দেশ ছেড়ে চলে যাবো, এবং বিদেশে একজন অত্যন্ত পুরস্কৃত সম্মানিত উদ্বাস্তু লেখক হিসেবে বাঁচতে চাই না। আমি বাঁচব আমার নিজের দেশে, এবং বাংলাদেশে এবং এমন একটি বাংলাদেশ আমি চাই- যে বাংলাদেশ আলবদরমুক্ত, রাজাকারমুক্ত, মৌলবাদমুক্ত।

আন্তর্জাতিক সংগঠন পেন এর আমন্ত্রণে বিশ্বখ্যাত কবি হাইনরিশ হাইনের উপর গবেষণা বৃত্তি নিয়ে জার্মানি যান ৭ আগস্ট। পরিবারের লোকেরা এবং অনুরাগীরা কেউ তাকে একা যেতে দিতে চান নি। কিন্তু তিনি একাই যান। এর মাত্র ৫ দিন পর ১২ আগস্ট মিউনিখস্থ নিজ কক্ষে

তাকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। তিনি চেয়েছিলেন ৩০ বছরের আরেকটি জীবন, দ্বিতীয় জীবন। তাঁর ইচ্ছাটা শরীর গ্রহণ করতে পারেনি। তিনি বেঁচেছিলেন মাত্র ১৬২ দিন। আজও তার অনুরাগীরা তাঁকে সমানভাবে উপলব্ধি করে। তিনি নেই এটা আজ বড় বেশি অনুভব হয়।



রসুনের কোষের ন্যায় ধার্মিকরাও এক বিন্দুতে আবদ্ধ

লি খে ছে ন – শা হা দা ত হো সে ন



যে যাই বলুক ইসলাম কখনোই ভিন্নমত ও পথকে স্বীকৃতি দেয় না তথা স্বীকার করে না। ইসলামের চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো অপরকে তার মত ও পথের অনুসারী বানানো। তাদের মধ্যে নেতৃত্ব,গোষ্ঠীগত ও বিভিন্ন কারণে যত মত পার্থক্যই থাকুক না কেন সর্বশেষে তারা এই মত পোষণ করে যে

" সকল মুসলমান ভাই ভাই '। ক্ষমতা, গোষ্ঠীগত ও বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দন্দ্ব ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের থাকতে পারে কিন্তু তাই বলে তারা ভিন্নমত ও পথকে কখনোই মুসলিম ঈমানদার ভাইয়ের চেয়ে প্রাধান্য দিবে না। তাছাড়া প্রকাশ্যে অথবা রননীতি রনকৌশলের কারণে আপোষ করতে বাধ্য হলেও তারা এক ও অভিন্ন থাকবে ও গোপনে মিলিত হবে। নবী মুহাম্মদ হুদাইবিয়ার সন্ধি করেও শক্তি সঞ্চয়ের পর তা ভঙ্গ করেছিলেন। এক মুসলমান অপর মুসলমানের দোষ ডেকে রাখবে- এটি ইসলামী বিধান। তাই তো মাদ্রাসায় বাচ্চাদের উপর এত এর নির্যাতন করার পরেও কোনও হুজুর সমালোচনা করে না। সৌদি আরবে ঘরে ঘরে বাংলাদেশী গৃহকর্মী নির্যাতিত হওয়ার পরেও হুজুররা সৌদি আরবের সমালোচনা করে না। ইসলামের নেশা হারাম হওয়া সত্ত্বেও হুজুররা হিরোইন ব্যবসায়ী তালেবানদের সমালোচনা করে না।

মাওলানা ভাসানী সারা জীবন কমিউনিজম এর রাজনীতি করেও মাথার টুপি, আলখাল্লা ও নামাজ ছাড়ে নাই। সেই

ভিতর দিক দিয়ে বাংলাদেশের বামপন্থী রাজনীতিকে ইসলামাইজেশন করে দুর্বল করে দিয়েছে। তাই C P B মত কমিউনিস্ট পার্টির অনেক কর্মীদের মুখ শুনা যায়, খোলাফায়ে রাশেদীন এর আমলে সমাজতন্ত্র ছিল। হুজুর এই কৌশল অবলম্বন করে অচল মালকে অর্থাৎ ইসলামকে সর্বাধুনিক মতবাদ তথা সমাজতন্ত্র বানিয়ে দিয়েছে। আজ বিএনপি রাজনীতি করছে জামাত নিয়ে, আওয়ামী লীগ রাজনীতি করছে হেফাজতকে নিয়ে। কিন্তু এই দুটি ইসলামিক দলই বিএনপির আওয়ামী লীগকে পছন্দ করে না। কারণ তারা একই কোরআন ও একই হাদিস পড়ে সংগঠন করছে।

জ্ঞানবিজ্ঞানে মুক্তমনাদের থেকে অনেক পিছিয়ে থাকার পরেও ধর্ম ব্যবসায়ীরা এত কৌশলী হল কিভাবে? বিজ্ঞানের মতে কোনও কিছুই কারণ ব্যতীত সংগঠিত হয় না। মুক্তমনাদের জীবিকার জন্য অসংখ্য পথ খোলা রয়েছে কারণ তারা আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সংস্পর্শে এসে অনেক কিছুই শিখেছে এবং এদিকেই তাদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে রেখেছে। ভিন্ন দিকে নজর দেওয়া তাদের পেশার জন্য ক্ষতিকর। তাই তো এক্ষেত্রে তাদের মধ্যে একতা লক্ষ্য করা যায় না।

কিন্তু ধর্মান্ধদের জন্য শুধু ধর্ম ব্যবসা ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নাই। কারণ তারা ১৪৫০ বছর পূর্বের আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগের অনুপযোগী, ফালতু, বানোয়াট গল্প

ভিন্ন আর কিছুই তারা শিখে নাই। এই জ্ঞান দিয়ে বর্তমান যুগে কামলাগিরিও করা যাবে না। ওয়াজ নসিয়ত করে যে পরিমাণ অর্থ উপার্জন করা যায় সেই যোগ্যতার দ্বারা তারা হয়তো একটি কারখানার নিম্ন পর্যায়ের শ্রমিকের কাজ পাবে। তাতে করে কোটি কোটি টাকা অর্জন করা কল্পনাও করতে পারবে না। তাই ধর্মের প্রচার ও প্রসারের ব্যাপারে তারা আন্তরিক হবে এটাই স্বাভাবিক। যত অন্ধা বাড়বে তত নাকি টাকা বাড়তে থাকবে।

আবার এখানে হুরের লোভ দেখিয়ে নাচানোর মত বিশাল এক অন্ধ গোষ্ঠী রয়েছে।

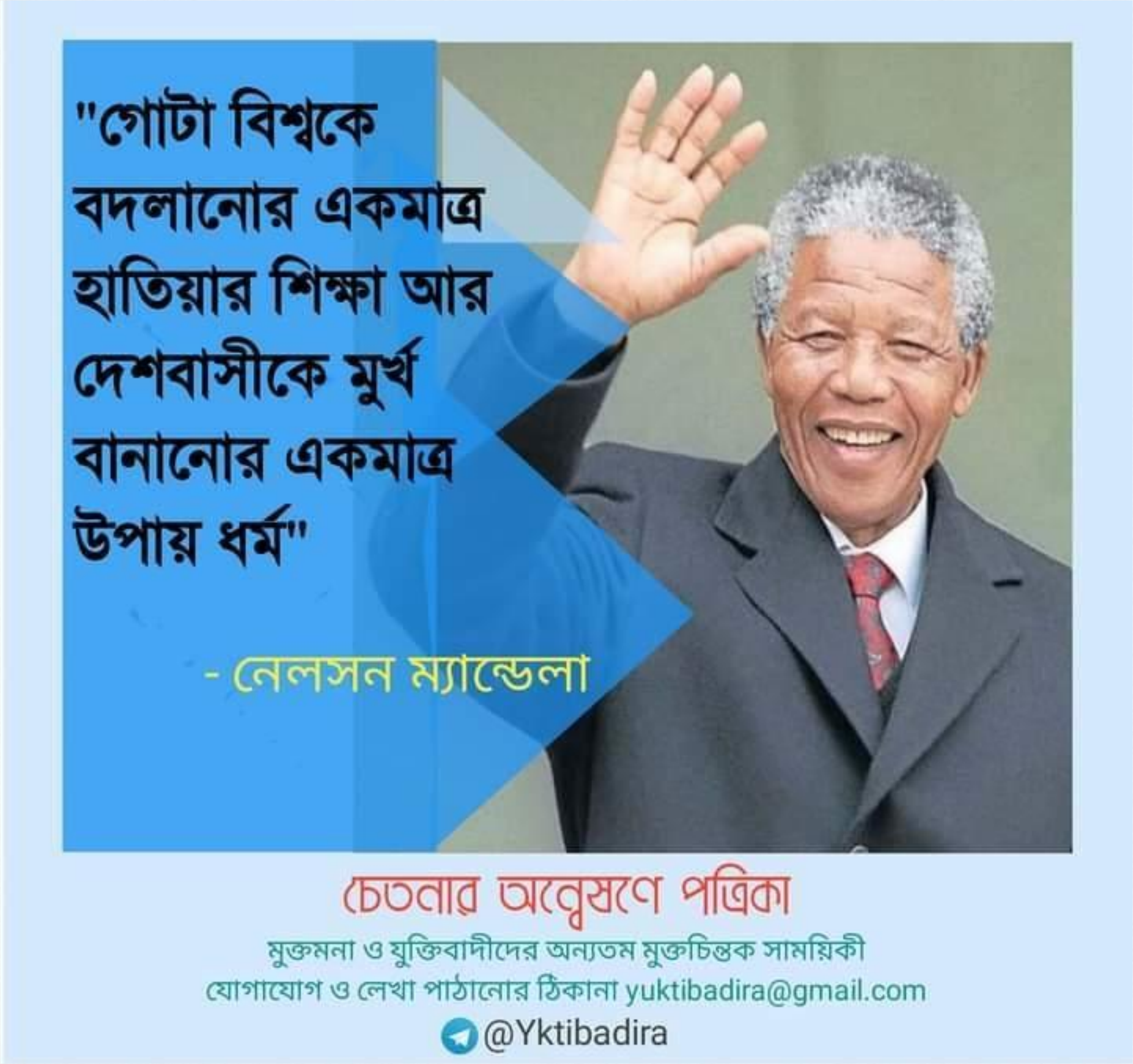
তাই দেশে পরিকল্পিত উপায়ে অন্ধ জনগোষ্ঠী সৃষ্টির লক্ষ্যে সুদূর অতীত থেকেই তারা একটি সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে রেখেছে। এটি তিনটি পর্যায়ে সম্পাদন করা হয়।

প্রথমটি হল রেডিক্যাল তথা জিহাদি গ্রুপ, দ্বিতীয়টি হল নির্বিচ্ছিন্নভাবে ইসলাম প্রচার করার গ্রুপ এবং তৃতীয়টি হল মিনিমাইজ করা তথা তাকিয়া গ্রুপ।

সাধারণত ১২ থেকে ২০ বছরের বয়সী অবুঝ যুবকদেরকে জিহাদি বানানো হয়। যাদের ইসলাম সম্পর্কে তেমন জ্ঞান নাই। ধর্মব্যবসায়ী সুবিধাবাদী নেতৃবৃন্দ ও ধান্দাবাজ ওয়াজিরা কেবল ধান্দা ও ইসলাম প্রচার করে বেড়ায়। মডারেট তাকিয়াবাজরা কখনো যুক্তি প্রমাণে হেরে গেলে বলবে, আরে ভাই এসব মোল্লারা যা বলে এগুলো ইসলাম

নয়। অথচ এরা কখনোই মোল্লাদের কার্যকলাপের নিন্দা করে না। বরং এটি তাদের সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার একটি কৌশল মাত্র।

তাদেরকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা অথবা সুনির্দিষ্ট দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ না করে তাদের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ও তাদেরকে খুশি করার জন্য মডেল মসজিদ ও মাদ্রাসা বানিয়ে দিলে কোনও লাভ হবে না। এই অকৃতজ্ঞরা যদি একবার গদিতে যাইতে পারে তাহলে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির নাম নিশানা বাংলাদেশ থেকে মুছে ফেলবে।



সূচিপত্র

যুক্তিবাদী নবধারার অভিবর্তন

লিখেছেন – মহম্মদ মহসীন



অভিবর্তন অর্থাৎ উত্থান। যুক্তিবাদ, যুক্তিবাদভিত্তিক চেতনার উন্মেষ প্রকৃতির বিবর্তন নিয়ে কিছু পড়াশুনা করলে জানতে পারা যায়, বিভিন্ন যুগে তার পরিশীলন পরিসরের তাবৎ পরিবর্তন ঘটে গেছে, বিশেষত রেঁনেসাঁ

পরবর্তী যুগে, সারা পৃথিবীজুড়ে যে শিল্পায়ণ ঘটে, তার ফলে মানবসমাজে এসে গেল নবধারার উত্থান। কয়েকটি ধাপে এই পর্যায়গুলির ক্রমান্বয়ী আগমন ঘটে। সেগুলি বলা যায়, the Age of Reason, the Scientific Revolution, the Age of Revolution, the Industrial Revolution, the Age of Imperialism ইত্যাদি। রাজনীতি-ধারার যে পরিবর্তন এল, তাতে আরো বেশি বেশি করে ধর্মকে হাতিয়ার করে গড়ে তোলার প্রয়োজন হতে থাকল। আর ধর্মকে যতই যুক্তিবাদের খোলস পরানোর চেষ্টা হতে থাকল, গোঁজামিলের পাহাড় জমা হতে থাকল ততই দ্রুততার সঙ্গে।

আশার কথা হল ধর্মের অন্ধতা মানুষের মনকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারে না। তাই ধর্মের গোঁজামিলগুলো একটু ভাবলেই আমাদের কাছে ধরা পড়ে।

ধর্মের যত বাড়বৃদ্ধি দেখা যাচ্ছে, সমতালে ধর্মের কুসংস্কারের বিরুদ্ধমতও কিন্তু শক্তিশালী হয়ে উঠছে।

মানুষ যদি একটু প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে ধর্মের দিকে তাকায়, তাহলে ধর্মের গোঁজামিলগুলি সহজেই ধরা যায়। যুগ যুগ ধরে ধর্মগুরুদের মিথ্যাচার সমাজে অসত্যকে সত্যের প্রতিষ্ঠা দেয়।

ধর্মোপজীবীরা ধর্মকে আশ্রয় করে কেরিয়ার তৈরি করে। রাজনীতির লোকেরা এদের স্পনসর করেন। মানুষে

মানুষে উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ধর্মের এক 'মহান-অবদান' সমাজে।

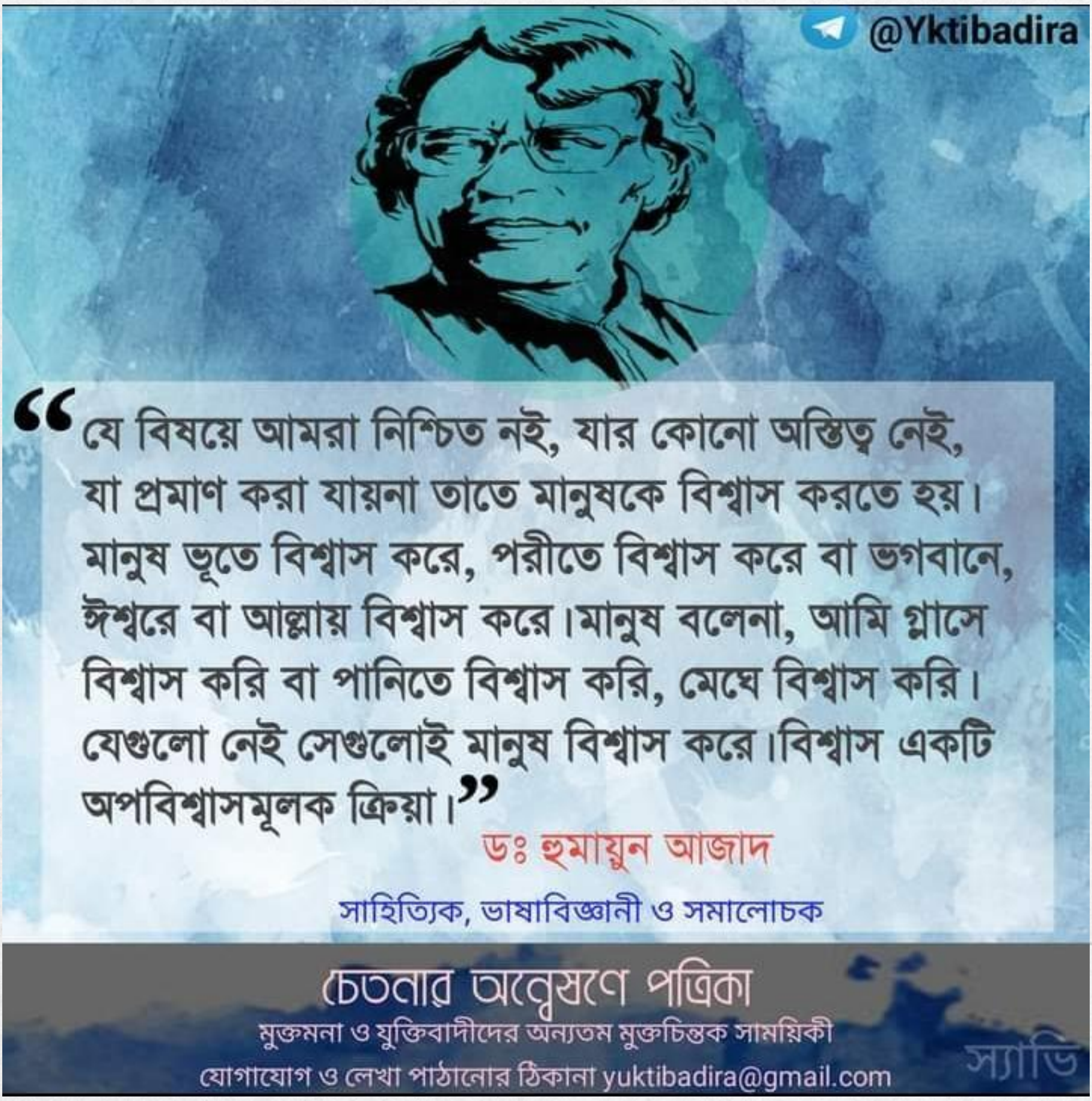
ধর্ম হল, পরিবার, সমাজ ও দেশ হতে দেশান্তরে, ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারের মাধ্যমে, ঈশ্বর, আত্মা, প্রেতাত্মা, পরমাত্মা জাতীয় অস্তিত্বহীন বিষয়কে বিশ্বাসনীয় করে তুলে সেই অন্ধবিশ্বাসের নেশায় প্রতিদিন যাপনের তন্ত্র গঠন করে, ধর্মান্ধকারে নিমজ্জিত মানুষকে ভক্তিরসে জারনের মাধ্যমে অন্ধকারতর পথের দিশায় বিভ্রান্ত করে মানুষের যুক্তিশীল চেতনাকে প্রতিনিয়ত প্রতিহত করার মাধ্যমে রাজনীতি ও ধর্মোপজীবিদের কায়েমি স্বার্থ চরিতার্থ করার এক মোক্ষম হাতিয়ার।

ধর্ম হলো পরিশ্রম না করে জীবিকার্জনের সহজতম উপায়।

যেহেতু ধর্ম রাজনীতির এক মোক্ষম হাতিয়ার, ধর্মকে ব্যবহার করে সম্প্রদায়গত আবেগকে কাজে লাগিয়ে ভোটবাক্সে সাফল্য পাওয়া যায়, যেহেতু ধর্ম নেশায় আচ্ছন্ন জনগনকে তাদের নেশার বস্তুটি সরবরাহ করতে পারলেই রাজনৈতিক ফায়দা তোলা যায়, তাই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার সমস্যা হয় না। ধর্ম নেশাগ্রস্তদের ধর্মীয় আকাঙ্খা পূরণ করতে পারলেই অনেক দায় পূরণ না করলেও রাজনীতিগত কোনও ক্ষতির আশঙ্কা থাকে না, তাই মানুষ ধর্মের অন্ধকারে বাস করুক, পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই

সেটি চায়। ধর্মনেশায় উৎসাহ যোগায়, ধর্মান্ধতা প্রসারে ইন্ধন যোগাতে চায়।

এবার সিদ্ধান্ত আপনার, বর্জ্যকে পূজ্য করবেন, না কি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সার্বিক বিকাশের পথে চলবেন।



সূচিপত্র

তোমার সুরে সুরে

লি খে ছে ন - এ ণা ক্ষী সা হা



গণিত কী? গণিত আমাদের জীবনে কতটা গুরুত্বপূর্ণ? কেউ বলবে,

"বা রে! এটা আবার প্রশ্ন হল? সকালে কখন উঠব, কোন কাজে কত সময় দেব, কতক্ষন পড়াশোনা করব, বাজার করতে গিয়ে কিভাবে দরদাম করব, দিনের শেষে আয়ব্যয়ের হিসেব করবো -- গণিত ছাড়া তো কোনোটাই হবে না।"

চিন্তাশীল ছাত্ররা আরেকটু গভীরে গিয়ে বিষয়টা ভাববে। তারা বলবে, "হুম... গণিত তো একটা গুরুত্বপূর্ণ tool -- পদার্থবিদ্যা হোক বা জীববিদ্যা, কিংবা রসায়ন। সবেতেই তো গণিতের কমবেশি প্রয়োগ রয়েছে। গণিত না শিখে কোনোটাকেই শেখা যাবে না।"

উপরের কথাগুলো প্রতিটিই ঠিক। এ কথা মোটেই অস্বীকার করার উপায় নেই যে জীবনের সবক্ষেত্রে গণিত কতটা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে আছে!

এবারে আরেকটু গভীরভাবে ভাবা যাক, মনটাকে আরো একটু শান্ত করে। কেন গণিত বিষয়টা সবকিছুতে নাক গলালো এরকম? কেন উচ্চস্তরে গিয়ে গণিত এবং পদার্থবিদ্যা পরস্পরের আরো কাছাকাছি চলে আসে? কেন মহাবিশ্বের সবকিছুকেই এদের মাধ্যমে ব্যাখ্যা দেওয়া যায় বা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়?

আসলে পুরো বিষয়টা যেন একটা সেট অফ রুলস -- যা পুরো বিশ্বজগতে একই। আর তা সৃষ্টির আদিকাল থেকেই এক। কোথাও কোনো অন্যথা নেই। আমরা গণিত তৈরি

করিনি, আমাদের জন্মের আগে থেকেই গণিত রয়েছে। তখনই মনে প্রশ্ন জাগে যে কেন এমনটা হলো - কে তৈরি করলো এই নিয়মগুলো। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষ হিসেবে আমরা ধরে নিই ঈশ্বরই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। তাহলে বিজ্ঞানকে ঈশ্বরের ভাষা আর গণিতকে সেই ভাষার ব্যাকরণ বললে অত্যুক্তি হয় কি?

এতক্ষণে নিশ্চয়ই একটু হলেও উপলব্ধি করা যাচ্ছে যে জীবনে গণিতের গুরুত্বটা আসলে আলু-পটলের দরদাম বা সিমেন্ট-বালির হিসেব কিংবা পদার্থবিদ্যার পরীক্ষায় পাশ করার চেয়ে অনেক অনেক বেশি গভীর! মহাবিশ্বের সুনিপুণ সূক্ষ্ম ডিজাইনকে জানার উপায় হলো গণিত। মহান স্রষ্টার লীলাখেলা বোঝার উপায় হলো গণিত।

একটু নিজের দিকে তাকানো যাক। এই যে আমি, একজন গণিতপ্রিয় ছাত্রী (যদিও পড়ছি ডাক্তারি), আমার আসল পরিচয় কী? আমার signature কী? আমিও মানুষ। আরেকটা মানুষের সাথে আমার পার্থক্য কোথায়? কেউ বলবে, জেনেটিক গঠন। তোমার আমার জিনের মৌলিক উপাদানে কি আদৌ কোনো পার্থক্য আছে? নেই। তোমার ডিএনএ-তে যেসব পিউরিন বা পিরিমিডিন বেস রয়েছে আর আমারটায় যেসব রয়েছে, তারা একই। দেহকে অণু-পরমাণু স্তরে গিয়ে বিশ্লেষণ করলে বিষয়টা সবচেয়ে

সহজে অনুভব করা যায়। যদি বলি, আমাদের পার্থক্য রয়েছে আমাদের চিন্তা, চেতনা, অনুভূতির মধ্যে, তাহলে তো এটাও জানা যে সেগুলোর উৎসস্থল আমাদের ব্রেন। কিন্তু ব্রেনের মধ্যেও তো তফাৎ নেই! মৌলিক উপাদানটা তো একই - একগুচ্ছ নিউরন, যাদের আন্তঃযোগাযোগের ফলে জন্ম নেয় সব চিন্তা, চেতনা, অনুভূতি; তৈরি হয় বুদ্ধি, স্মৃতি, যুক্তি। তোমার নিউরন আর আমার নিউরন তো একই, একই অণু পরমাণু কিংবা আরো গভীরে গিয়ে বলতে হলে, একই মৌলিক কণা দিয়ে তৈরি। সবই ইলেকট্রন প্রোটন নিউট্রনের খেলা। এদেরই একেকরকম সজ্জা, একেকরকম ইন্টারঅ্যাকশন দিয়ে তৈরি হয় একেকটা মৌল। সেইসব মৌল জুড়ে তৈরি হয় অসংখ্য রকমের যৌগ। একেকরকম তাপমাত্রায় তাদের একেক রকম আচরণ। ভেতরে সবটাই আসলে এক। দূর আকাশের নীহারিকার ভেতরে যা আছে, ঠিক সেই উপাদানই রয়েছে একটা পিঁপড়ের শরীরেও।

যা আছে ব্রহ্মাণ্ডে,

তাই আছে দেহভাণ্ডে।

অর্থাৎ এই সম্পূর্ণ বিশ্বজগৎ জুড়ে ছড়িয়ে আছে একই উপাদান, এক মহাচৈতন্য, এক আদি অপরিবর্তনীয় সত্ত্বা- - যাকে আমাদের বৈদিক যুগের মুনি-ঋষিরা বর্ণনা করেছেন ব্রহ্ম নামে। উপনিষদে ব্রহ্ম কথার ধ্বনিগত অর্থ

হিসেবে বলা আছে - যা সর্বব্যাপী, যা সকল বস্তুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে ব্যাপ্ত। এই আদিসত্ত্বাই বিশ্বজগতের উৎস, বিশ্বজগৎ আসলে এই বিমূর্ত আদিসত্ত্বারই মূর্ত প্রকাশ। মূর্ত বলেই সেখানে নানারকম ভাঙা গড়ার খেলা চলে প্রতিনিয়ত। কোয়ান্টাম থিওরিও এই পরিবর্তনশীল জগতের মূর্ত রূপের মধ্যে মিশে থাকা বিমূর্ত সত্ত্বার অস্তিত্বকে সমর্থন করে। আসলে সবই ব্রহ্ম। জগতের সবকিছুর মধ্যেই পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে ব্রহ্ম। ব্রহ্মই আমাদের উৎস, বিনাশের পরেও ঠিকানা সেই ব্রহ্ম। আমাদের সম্পূর্ণ জীবনটাই এক অসাধারণ যাত্রা -- ব্রহ্ম থেকে সৃষ্টি হয়ে ব্রহ্মের সাথেই মিলিত হওয়ার যাত্রা! কারোর ক্ষেত্রে এই যাত্রার পথ হয় জ্ঞানযোগ, কারোর ক্ষেত্রে কর্মযোগ, কারোর ক্ষেত্রে ভক্তিযোগ আবার কারোর ক্ষেত্রে হঠযোগ। ব্রহ্ম যেন চরাচরব্যাপী এক অপূর্ব সুর! যে সুর শোনার জন্য মনের সঠিক টিউনিং দরকার --

কবিগুরুর ভাষায়,

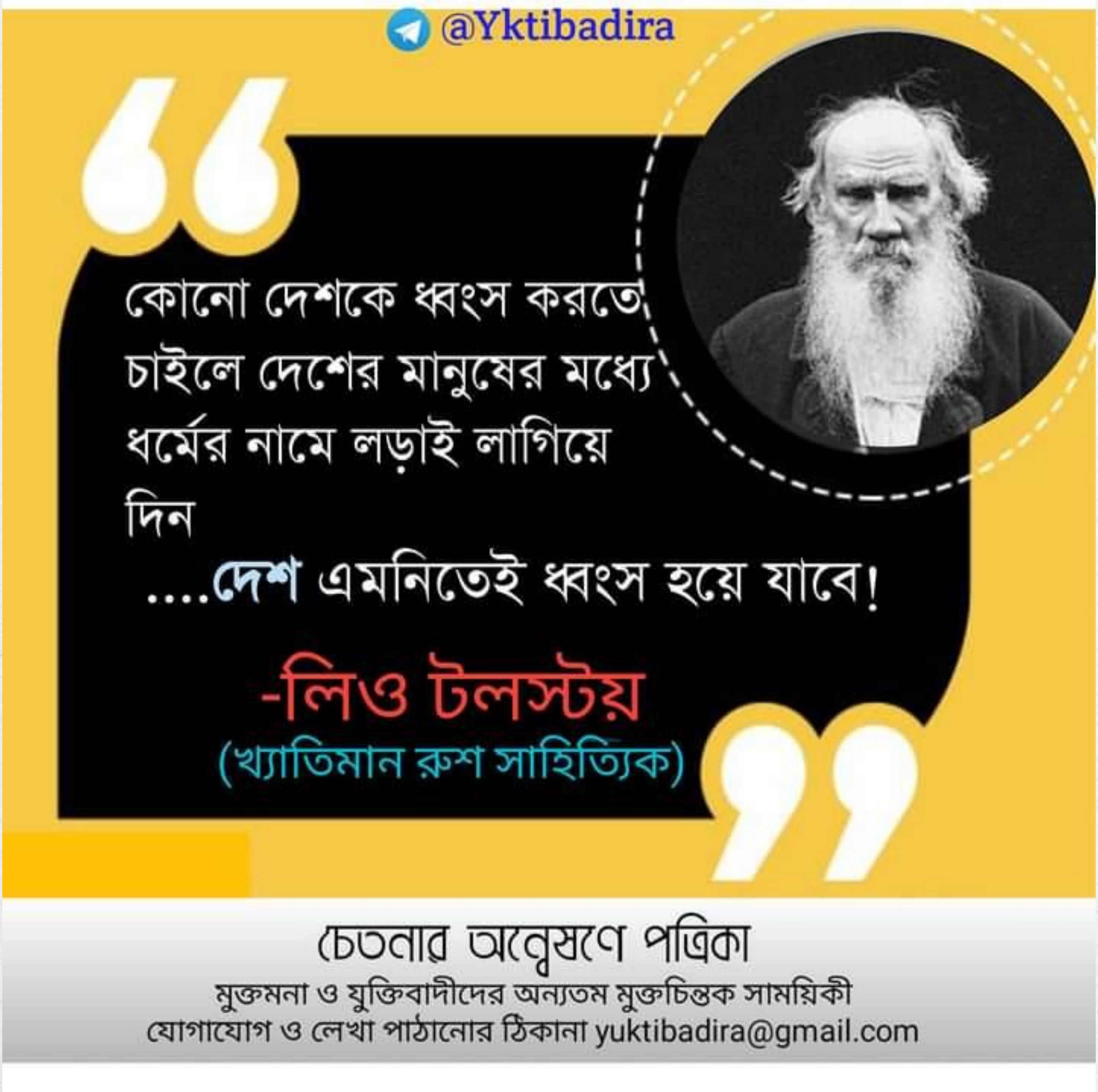
"আমার এ তার বাঁধা কাছের সুরে

ঐ বাঁশি যে বাজে দূরে,

গানের লীলার সে কিনারে

যোগ দিতে কি সবাই পারে,"

সেজন্যই তো বিজ্ঞানের চর্চা, গণিতের চর্চা! তুমিও ব্রহ্ম, আমিও ব্রহ্ম। "তোমার সুরে সুরে সুর মেলাতে"-ই তো জীবনের বেলা গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে যায়। তাই গণিত শুধুই দুয়ে দুয়ে চার আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এর মত কয়েকটা সূত্র নয়। গণিত মানে একগুচ্ছ চাবি -- মহাসৃজনের অজানা রহস্য উদ্ঘাটনের চাবি।



হিন্দু কোড বিল কাকে বলে?

লিখেছেন – পার্থপ্রতিম পাল



ভারত-পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাদের আগ্রহ আছে, তারা নিশ্চয়ই ভারতের "হিন্দু কোড বিল" বিষয়ে পড়েছেন। ভারত স্বাধীন হবার পরে পণ্ডিত নেহেরুর কেবিনেট এই বিলের মাধ্যমে হিন্দুসমাজ সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেন। বিয়ে, তালাক, নারী অধিকার,

পৈত্রিক সম্পত্তিতে উত্তরাধিকারের মতো সংবেদনশীল বিষয় ছিলো এই বিলে। বিগত সময় ধরে চলে আসা সনাতনী কুসংস্কার, ধর্মের নামে অনাচার ও অধিকারহরণ বন্ধ করাই ছিলো এই বিলের উদ্দেশ্য। যুগোপযোগী এবং বাস্তবিক সিদ্ধান্তই ছিল এই বিলের সারকথা।

বিদেশ থেকে উচ্চশিক্ষা পাওয়া, ইতিহাস ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ড. বি আর আম্বেদকার ওই কেবিনেটের আইনমন্ত্রী ছিলেন। তিনিই এই বিলের প্রণেতা এবং প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর সমর্থনেই তিনি বিলটি প্রস্তুত করে সংসদে উত্থাপন করেন।

যথারীতি মৌলবাদী হিন্দুরা এর বিরোধিতায় রাস্তায় নেমে আসে। তারা বিভিন্ন শ্লোক দিয়ে ব্যাখ্যা করেন, এটা হিন্দুধর্মের প্রতি সরাসরি আক্রমণ। তাই ধর্মরক্ষায় এই বিল বন্ধ করতে হবে। একজন হিন্দু হিসেবে, এই বিল বন্ধ করা ধর্মীয় দায়িত্ব। দীর্ঘদিন ধরে একে-অন্যকে-গালি-দেয়া হিন্দুবাদী সংগঠনগুলোও এই ইস্যুতে এক হয়ে যায়। তারা বলে, আমাদের ধর্ম ও সামাজিক আইন সৃষ্টিকর্তাপ্রদত্ত বেদ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোনো মানুষের এই বিষয়ে আইন করার অধিকার নেই।

ড. আম্বেদকার উত্তর দেন, হিন্দুধর্মের সাথে আমার কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা আছে ভিন্ন জনের ভিন্ন ব্যাখ্যা নিয়ে। বিভিন্ন হিন্দুবাদীরা তাদের সুবিধামতো শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন সামাজিক কুকর্মের বৈধতা দেয়। তাই একটি স্পষ্ট আইন দিয়ে নিয়ন্ত্রণ না করলে, অনাচার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

এতে মৌলবাদীরা আরও ক্ষেপে গিয়ে তাঁকে এবং তাঁর সরকারকে নাস্তিক আখ্যা দেয়। সরকার সেকুলারাইটিস রোগে আক্রান্ত বলে প্রচার করা হয়। ধর্মান্ধদের এরকম উন্মত্ততা দেখে কংগ্রেসের দুর্বল মানসিকতার লোকজন ঘাবড়ে যায়। তারাও আম্বেদকার ও নেহেরুকে বিলটি পাশ না করে ফেরত নেবার জন্য অনুরোধ করতে থাকে।

আম্বেদকার তার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন। পণ্ডিত নেহেরুও নৈতিকতার দায় থেকে সমর্থন উঠিয়ে নিতে পারছিলেন না। তাই তিনি ঘোষণা দেন, এই বিলটি ফেরত নিলে তিনি ক্ষমতায় থাকার নৈতিক অধিকার হারাবেন। তাই কোনোভাবেই তিনি বিল ফেরত নিতে চান না, বরং পুনরায় পাশ করার চেষ্টা করতে চান।

যারা সরাসরি মৌলবাদী হিসেবে পরিচয় দিতে লজ্জা পেতেন, কিন্তু মনে মনে মৌলবাদী, তারা এই বিলের একটু অন্যভাবে সমালোচনা করেন। তারা বলেন, শুধু এক ধর্মের

জন্য আইন বানানো কতোটুকু উচিত? একাধিক বিয়ে করা যদি হিন্দুদের জন্য নাজায়েজ হয়, তবে মুসলমানদের জন্য জায়েজ কেন? যাদের ভোটে সরকার ক্ষমতায় এসেছে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের নিয়ন্ত্রণে আইন বানানো হলে, মুসলমান ও অন্য সংখ্যালঘুদের জন্য আইন বানানো হচ্ছে না কেন? সরকার কি মুসলিমদের ভয় পায়?

বিল পাশ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন নেহেরু। সরকারের সময়ও শেষ হয়ে আসছিল। এসময় আম্বেদকার নেহেরুকে আবেদন করেন যে তাঁর শরীর খারাপ হচ্ছে। তিনি বিল পাস হবার পরেই নিজেকে ডাক্তারের হাতে ছাড়তে চান, তার আগে না। নেহেরু আবার চেষ্টা করেন। আরও ভয়াবহ বিরোধিতা আসে।

বছরখানেকের মধ্যেই ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। নির্বাচনের প্রস্তুতি নেবার জন্য সময় দরকার ছিলো। তাই সব দিক বিবেচনা করে, পণ্ডিত নেহেরু বিল ফেরত নেবার সিদ্ধান্ত নেন। তবে ঘোষণা দেন, কংগ্রেস যদি পুনরায় ক্ষমতায় আসে, তখন এই বিল পুনরায় উত্থাপন হবে। ওই সেশনে বিল পাশ না হওয়ায় ড. আম্বেদকার অভিমানে ইস্তফা দেন এবং চিরদিনের জন্য কংগ্রেস ত্যাগ করেন।

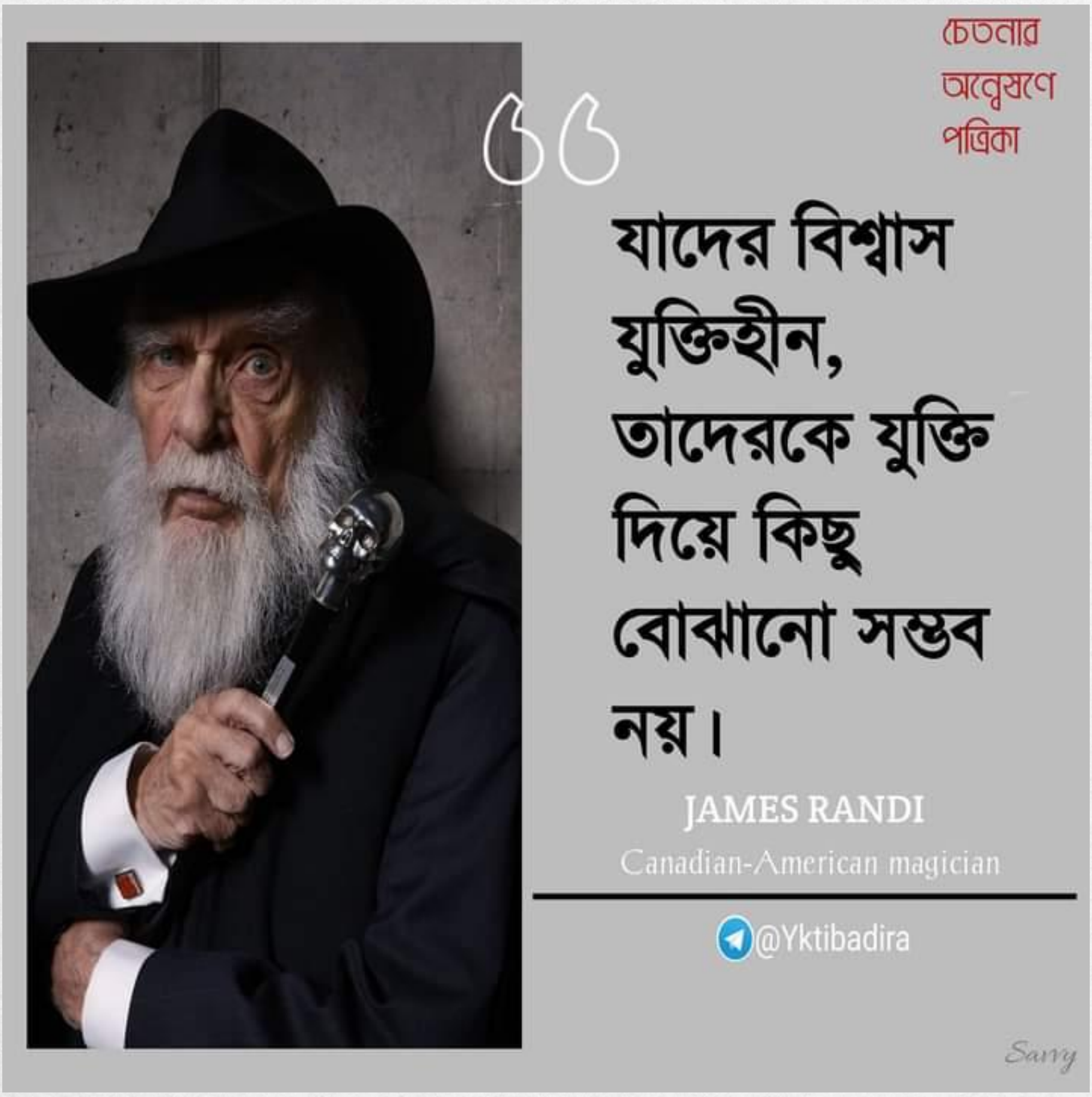
ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল সেই হিন্দু কোড বিল। এটাই মনে হচ্ছিলো জেতা-হারার ফ্যাক্টর। এটা ছিলো অনেকটা হিন্দু মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে নেহেরু আর কংগ্রেসের নৈতিক যুদ্ধ। হিন্দুবাদীরা শুধু আইনের বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত হয়নি, তারা নেহেরুর বিরুদ্ধে নির্বাচনে প্রার্থী দেয় এবং নির্বাচিত হলে এই বিল চিরকালের জন্য আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করার প্রতিশ্রুতি দেন। এলাহাবাদের ফুলপুর আসনে নেহেরুর বিরুদ্ধে দাঁড়ান সে সময়ের বিখ্যাত ধর্মনেতা প্রভুদেব ব্রহ্মচারী।

হিন্দুবাদী নেতার জনপ্রিয়তা এবং প্রতিটি বক্তৃতায় নেহেরুর হিন্দু কোড বিলের পক্ষে বক্তৃতা শুনে মনে হচ্ছিল, নেহেরুর হার অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু হিন্দুবাদীদের লম্ফঝম্প বেশি হলেও শেষ পর্যন্ত ভোটে জয়লাভ করেন নেহেরু। তাঁর দল কংগ্রেস নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সংসদে ফিরে আসে। ফিরে এসেই তিনি পুনরায় সেই বিল তোলেন। ১৯৫৬ সালের মধ্যে ৪টি আইনে ভাগ হয়ে বিলটি পাশ হয়।

অনেক বছর পার হয়ে গেছে। আজ সেসব ইতিহাস। ভারত ড. আম্বেদকারকে ভারতরত্ন ঘোষণা দিয়েছে, সংবিধান নির্মাতার সম্মান দিয়েছে, দলিতের ও নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রবাদপুরুষ আখ্যা দিয়েছে। এমনকি

আজকের বিজেপিও তাঁর সংস্কারকে সম্মান দেখায়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই ড. আম্বেদকারকে মরতে হয়েছিলো নাস্তিক, দেশবিরোধী, ছুপা মুসলিমসহ আরও বহু গালিময় আখ্যা নিয়ে।

সমসাময়িক ইতিহাস নিয়ে রাজনীতিবিদদের শিক্ষা নেয়া দরকার। তবে সবচেয়ে বেশি শিক্ষা নেয়া দরকার আমাদের সাধারণ জনগণের। মনে রাখতে হবে, ধর্ম, জাতীয়তাবাদ বা অন্য যেকোনো নামে উন্মাদনা যতো বেশিই হোক, শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। উন্মাদনা দেখে ভুল পথে হাঁটলে হয়তো সাময়িক জয় বলে মনে হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা পরাজয় হয়েই দেখা দেয়।



সূচিপত্র

আসাম সম্মেলন সফল করুন



প্রিয় সতীর্থ,

'বিজ্ঞানমন্মস্ক যাত্রা'র জন্মলগ্নে থেকে আমাদের সমাজের প্রচলিত সব ধ্যান-ধারণা, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং সমাজের ক্ষতিকর ঐতিহ্যাগুলোর বিরুদ্ধে এক জনমত সৃষ্টি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দিয়ে ঐ সমস্যাগুলোর সত্যাসত্য নিরূপন করে মানুষের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করে আসছে!

আমরা সবাই উপলব্ধি করছি, কিছু অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কার আমাদের সমাজের স্বাভাবিক অগ্রগতিকে

রুখেছে এবং আমাদের মানসিক উত্তরণে বাঁধক হয়ে দাঁড়িয়েছে!

ধর্মান্ধতা আর পশ্চাদগামী চিন্তা-চেতনা মানবীয় মূল্যবোধের দ্রুত স্খলন ঘটিয়েছে! সাম্প্রদায়িক মেলামেশা, সামাজিক শান্তি, মানবীয়তার মতো বিষয়কে মাটিতে মিশে দেওয়া হচ্ছে!

এমন একটি জটিল সময়ে, বিজ্ঞানমনস্ক যাত্রা' সংগঠিত রূপ নিয়ে আর যুক্তিবাদের আধারে বিজ্ঞানমস্কতার চর্চা এবং প্রসার-প্রচারে গুরুত্ব দিচ্ছে! 'বিজ্ঞানমনস্ক যাত্রা' অসম সংগঠনটির জন্ম হয়েছে ৬ই ফেব্রুয়ারি, ২০২২ সালে! আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই, আমাদের সমাজের প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক, যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় ধর্মান্ধতা আর পশ্চাদগামী শক্তির সামনে রুখে দাঁড়াবে!

সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখে বিজ্ঞানমনস্ক যাত্রা এগিয়ে যাচ্ছে! কৃষ্টি-সংস্কৃতি-শিক্ষার কেন্দ্র নগাঁও জেলার যুক্তি আর বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিদের ঐক্য আর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এ লড়াই রাজ্যের সব জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে!

বিজ্ঞানমনস্ক যাত্রা, নগাঁও জেলা সম্মেলন আগামী মাসের ৫ তারিখ, রবিবার, দুপুর ২ টা থেকে আরম্ভ হবে!

সন্মলিনে নগাঁও জেলা সমিতি গঠন হবে আর আগামী বছরের কর্মসূচি তৈয়ার হবে!

বিজ্ঞানমনস্ক যাত্রা, নগাঁও জেলা সাম্মিলনেআপ আর উপস্থিতি এবং সাহায্য কামনা করছি!

সভাস্থল: Indian Medical Association House, 6 Ali, Nagaon, Assam

সময়: দুপুর ২ টায়, ৫ মার্চ-২০২৩

রাহুল মুক্তিয়ার

আকিব হোসেন আহমেদ

নয়ন জ্যোতি ভূঞা

বিজ্ঞানমনস্ক যাত্রা, আসাম১

Contact - 9769128102/9864105159

Email: yvigyanmanashka@gmail.com

জলঙ্গী যেদিন ভোটের ইস্যু হবে

লি খে ছে ন – অ নু জ বি শ্বা স



জলঙ্গী নদী দিন দিন কোমায় চলে যাচ্ছে। নদিয়া মুর্শিদাবাদের অন্যতম এই জলঙ্গী একসময় গঙ্গা পদ্মা রিভার সিস্টেমের এক খরস্রোতা নদী হিসাবে লোকমুখে খোড়ে নামে পরিচিত হয়েছিল। আজ জলঙ্গী আই সি ইউ তে। না, কোনও প্রাকৃতিক কারনে নয়, আমাদের নিরন্তর উদাসীনতায়। নিম্ন গাঙ্গেয় অববাহিকায় বিগত দেড় দুই হাজার বছরে ভূমিরূপের বিশেষ কোনো পরিবর্তন হয়নি।

ভূ গর্ভস্থ ভৌম জলস্তর মোটামুটি একই উচ্চতায় রয়েছে। এখনও তিন চারটে পাইপ পুঁতে নলকূপের জল যথেষ্ট পরিমানে পেতে কোনও অসুবিধা হয় না। মোটামুটি একহাজার বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত জলঙ্গী অববাহিকায় প্লেট টেকটোনিক এর প্রভাব পড়া প্রায় অসম্ভব, প্রভাব পড়লে বিশ্বের বৃহত্তম গাঙ্গেয় বদ্বীপের চরিত্র টাই বদলে যাবে। তাই কালের নিয়মে জলঙ্গী হারিয়ে যাচ্ছে এমন দাবি পাগলের প্রলাপ ছাড়া আর কিছু নয়।

গঙ্গা পদ্মা রিভার সিস্টেমের নদীয়া মুর্শিদাবাদ এবং পার্শ্ববর্তী যশোর ঝিনাইদহের কয়েক লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে জলঙ্গী ছাড়াও বাংলাদেশে থাকা ভৈরব, কপোতাক্ষ, রূপসা নদীর অবস্থা অপেক্ষাকৃত অনেক ভালো। অন্যদিকে জলঙ্গীর মত ভারতে থাকা চূর্ণী, ইছামতী নদী গুলোও আজ মরতে বসেছে। কপোতাক্ষ, রূপসার মত ছোট নদীকে জাতীয় জলপথে পরিনত করে বাংলাদেশ তাদের লাভজনক ট্রেড রুট বানিয়েছে। আর আমরা নদী বাঁচাও আন্দোলন করছি।

আসল সমস্যার উৎপত্তি হয়েছে ফারাক্কা ব্যারেজ থেকে। ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরী করে আমরা ভেবে নিয়েছি সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। বাংলাদেশকে জলচুক্তিতে হাফ ডজন গোল দেওয়ার আনন্দে আমাদের জামার কলার

উপরে উঠেছে আর Sustainable Development করতে পারার আত্মতুষ্টিতে তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলে বাঙালির অর্গ্যাজম হয়েছে। কিন্তু Development কে Sustain করতে যা যা করার দরকার সেগুলো আমরা না করে আমাদের দায় এড়িয়ে গিয়েছি। ফারাক্কা ব্যারেজের বাইপাস সার্জারি হিসাবে যে ফিডার ক্যানাল তৈরী হয়েছে তাতে জলঙ্গী নদীর কোনও লাভ হয়নি। জলঙ্গীর উৎসমুখ গোপালপুর ঘাট পলি পড়ে মজে গিয়েছে। আমরা ড্রেজিং করে পলি না সরিয়ে সেই জায়গায় চাষাবাদ করছি। প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার নদী খাত বেমালুম ভ্যানিশ হয়ে গিয়েছে। অর্থাৎ গাছের গোড়া আমরা ইতিমধ্যেই কেটে ফেলেছি। তার উপর নদীর পাড়ে যথেচ্ছ পরিমাণে ঘরবাড়ী, অবৈধ ইটভাটা তৈরী হচ্ছে। নদীর পাড় বাঁধানো নেই। সেচ দপ্তর জেগে ঘুমাচ্ছে।

কৃষ্ণনগরে নতুন রেলব্রীজ তৈরি হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হচ্ছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু রেলব্রীজের বড় বড় পিলার গুলো নদীগর্ভে বসানোর ফলে যে পরিমাণ জায়গা দখল করেছে তার সম পরিমাণ জায়গা নদীর দুপাশে ড্রেজিং করে বাড়ানো হয়নি। উপরন্তু পাড়ের জমিতে বীজতালা করে চাষ হচ্ছে। এরফলে নদীখাতের আয়তন কমেছে, সমানুপাতিক হারে নদীর জলধারণ ক্ষমতাও কমেছে। কদমতলা ঘাটে শতাধিক বছর ধরে

প্রতিমা বিসর্জনের ফলে নদী গর্ভে মাটি, কাঠামো প্রভৃতি জমা হচ্ছে। হালে বছর দশেক ধরে কৃষ্ণনগর পৌরসভার উদ্যোগে প্রতিমার কাঠামো তুলে পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হলেও, বিগত একশ বছর ধরে যে পরিমান অবক্ষেপ নদীতে জমা হয়েছে তার জন্য পর্যাপ্ত ড্রেজিং কখনই হয়নি। গোলাপটি এলাকায় নদী ক্রমশঃ সরু হয়ে আসছে। জলঙ্গীর শরীর অপুষ্টি গ্রাস করছে। জলঙ্গী নদীকে গলা টিপে মেরে ফেলার সমস্ত রকম ব্যবস্থা আমরা করে ফেলেছি।

জলঙ্গী নদীর শরীরে এখনও প্রাণ আছে বাংলাদেশের ভৈরব নদীর দয়ায়। ভৈরবের বিভিন্ন উৎস থেকে এখনও যেটুকু জল আসছে তাতেই জলঙ্গী অক্সিজেন পাচ্ছে। ফরাক্কা ব্যারেজ প্রকল্প থেকে বাংলাদেশ শিক্ষা নিয়েছে। পদ্মা দিয়ে যেটুকু জল তারা সারাবছর পেয়ে থাকে সেই জলের পরিপূর্ন ব্যবহার করেছে। তার সুফল হিসাবেই এখনও জলঙ্গী নদীর শরীরে রক্ত সংবহন তন্ত্রটি সচল রয়েছে। ভারত বাংলাদেশের মধ্যে 54 টি আন্তর্জাতিক নদী আছে যেখানে শুধু গঙ্গা ছাড়া অন্য কোনও নদীর ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে সুষ্ঠু জলবন্টন চুক্তি নেই বলেই জলঙ্গী নদী এখনও বেঁচে আছে। ভৈরব আন্তর্জাতিক নদী। এর বিভিন্ন প্রবাহ কখনও ইছামতী, কখনও রায়মঙ্গল নামে প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশ এখনও আন্তর্জাতিক মঞ্চে

দুর্বল দেশ বলে আমাদের রক্ষে, নাহলে ফারাক্কা আর তিস্তার বঞ্চনার বিরুদ্ধে যেদিন দক্ষিন বঙ্গের ছোটো ছোটো আন্তর্জাতিক নদীগুলোর ক্ষেত্রে জলবণ্টন চুক্তি দাবি করে বসবে সেদিন আর কোনও ভাবেই জলঙ্গীকে বাঁচানো যাবে না।

এখনও সময় আছে, বিশল্যকরণী প্রয়োগ করতে পারলে কোমায় থাকা জলঙ্গী আবার বেঁচে উঠতে পারে। সবার প্রথমে পদ্মা থেকে জলঙ্গী নদীতে সরাসরি ফিডার ক্যানাল তৈরী করে নিরবিচ্ছিন্ন জল সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে। এরজন্য জলঙ্গী বাঁচাও আন্দোলনকে সামাজিক স্তর থেকে গণ আন্দোলনে রূপান্তরিত করতেই হবে। সেভ জলঙ্গী জাতীয় কর্মসূচী শুধুমাত্র কৃষ্ণনগরের এলিট শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জলঙ্গীর দুই পাড়ে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ সাধারন প্রান্তিক জনগণের মধ্যে এই আন্দোলনের প্রভাব শূন্য। এই বিরাট জনগোষ্ঠীকে আন্দোলন মুখী করা তখনই সম্ভব হবে যখন জলঙ্গীর দাবী সংসদীয় গণতন্ত্রের দাবী হিসাবে স্বীকৃত হবে। জলঙ্গীর দাবী, তথা জলের দাবী যেদিন ভোটের ইস্যু হবে সেদিন জলঙ্গী বাঁচবে, তার আগে নয়।

জলঙ্গী নদীর অববাহিকা আর কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্র প্রায় সমার্থক। জলঙ্গী একান্ত ভাবেই কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের নিজস্ব নদী। তাই হাতে সময় বেশী নেই, মাত্র

এক বছর। আগামী লোকসভা ভোটে দাবি উঠুক জলঙ্গী নদীকে কেন্দ্র করে। " হয় আমাদের জলঙ্গী নদী সারিয়ে দাও, নয়তো আমরা নোটায় ভোট দেবো" এই দাবীতে সোচ্চার হওয়া ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা খোলা নেই। রাস্তাঘাট, রেলপথ সারানোর দাবীতে তো অনেক ভোট হল, একবার নদী সারানোর দাবী নিয়েও আন্দোলন হোক। কৃষ্ণনগর লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার প্রায় সাত লাখ। এরমধ্যে জলঙ্গী দুই পাড়ে বসবাস করেন এমন জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। এর মধ্যে মাত্র একলাখ মানুষকে নদীর দাবীতে এক জায়গায় সংগঠিত করতে পারলেই সমস্ত রাজনৈতিক দলের রাতের ঘুম উড়ে যাবে, জলঙ্গী তখন দিল্লীর পার্লামেন্টে আলোচনার বিষয়বস্তু হবে। শীর্ণ কায়া জলঙ্গী আবার পূর্ণ কায়া হবে। নাহলে আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জলঙ্গীর অবস্থা বালুরঘাটের আত্রেয়ী নদীর মত হবে, জলঙ্গী নামের আগে চন্দ্রবিন্দু বসে যাবে।।

অনুজ বিশ্বাস,

(কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, ভারতীয় ডাক বিভাগ)

কৃষ্ণনগর, নদীয়া।

সূচিপত্র

কোরানে আল্লাহকে কি নবি মুহাম্মদের থেকে পৃথক করা যায়?

লি খে ছে ন – শ ম্ভু না থ চা র্বা ক



নবি ছিলেন মক্কার কুরাইশদের হাসমি গোষ্ঠীর লোক। ছোটবেলা থেকেই ছিলেন ভাবুক। বাবা মারা যাওয়ার পর মরুভূমির ঊষর প্রান্তরে অন্যের উট চরাতে চরাতে নিজের দুর্দশার কথা ভাবতেন। তার ধনী কাকারা তার দায়িত্ব নেননি। আবার এক চাচা আবু লাহাব মুহমুহাম্মদের উপর ছিলেন ভীষণ খাপ্পা ফলে নবির পয়লা নম্বর শত্রু। নবির

পূর্বপুরুষেরা সবাই পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী। নবির পৌত্তলিক দেব দেবীদের উপর রাগ বিদ্বেষের কারণ তার বাবা মারা যাওয়ার পর তার ধনী চাচারা নবিকে দেখেননি। আর এই চাচারা কাবা ঘরের দেবদেবীদেরকে কেন্দ্র করেই ব্যবসায় ফুলে ফেঁপে উঠেছেন। ফলে এই দেবদেবীদের প্রতি রাগ অবিশ্বাস আর মক্কার নির্জনে পারস্য ও গ্রীকদেশীয় উপকথা শুনতেন এবং ইহুদী ও খ্রিস্টান পুরোহিতদের সাথে একান্ত আলোচনায় একটা অবসেশান বা ঘোরের মধ্যে পড়েন। এর ফলে একেশ্বরবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নতুন আল্লাহর সৃষ্টি করেন, এবং নিজেকে মুশা বা ঈশার মত রসুল কল্পনা ভাবতে থাকেন। প্রশ্ন হচ্ছে, নবি যদি কাবাঘরের পরিচর্যা করে তার চাচাদের মতো কাবা ঘরের আয়ের ভাগ পেতেন তবে কি তিনি নতুন ধর্মের প্রবর্তন করতেন? নবি অবশ্যই এক বিশাল কৃতিত্বের অধিকারী, একদম নিঃস্ব অবস্থা থেকে এক বিশাল আরবীয়ান সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং তার সার্থক রূপদান করেছেন ধর্মের আশ্রয়ে। তার সৃষ্ট ইসলাম আজ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম ধর্ম। এই ধর্মের প্রধান হচ্ছে আল্লাহর বাণী (ওহি) সংবলিত কোরান এবং যে ধর্মীয় আচরণগুলি কোরানে নেই কিন্তু নবি পালন করতেন সেগুলিকে সুন্নাহ বলে। এবং সেগুলোর লিখিত রূপ হাদিস। নবির মৃত্যুর পরে লক্ষ লক্ষ হাদিস লেখা হয়েছে। বর্তমান সৌদির রাজপুত্র প্রিন্স সলমন নবির মৃত্যুর পর লেখা সব হাদিস বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন।

প্রায় প্রতিটি ডিগ্রীধারী অশিক্ষিত নিরক্ষর মুসলমান বিশ্বাস করে কোরানের প্রতিটি বাণী আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যাদেশ বা ওহি, কোনও মানুষের রচিত নয়। যেমন বড় বড় ডিগ্রীধারী অশিক্ষিত হিন্দুরাও মনে করে বেদ অপৌরুষকার। আল্লাহর পাঠানো ওহি গুলিই আল্লাহর রসুল মুহাম্মদের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে। যদিও সেই সময়েই আয়েশার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল আপনার আল্লাহ তো আপনার সুবিধার্থে ওহি পাঠাতে বিশেষ দেরী করেন না।

কোরানে আল্লাহর সর্বোৎকৃষ্ট ও সদ গুণাবলীর উল্লেখ আছে। তিনি সমস্ত যুক্তিবুদ্ধির সীমাকে অতিক্রম করে গেছেন। তিনিই আকাশের তারকারাজির মালিক, তিনি ছয়দিনে সপ্ত আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনিই মেঘ বৃষ্টিপাত বজ্র ঝড়ের স্রষ্টা। তিনি তার নিদর্শন দেখাতে নবিকে নিয়ে মেরাজে করে সপ্ত আকাশ ভ্রমণ করান এবং হাজার কিমি দূরবর্তী দুই মসজিদ ভ্রমণ করান এক রাত্রের মধ্যেই, এ যেন ধনী ব্যক্তি আল্লার তার দরিদ্র আত্মীয় মুহাম্মদকে ঐশর্য্য প্রদর্শন করাচ্ছেন। কোরান বেশ কিছু জায়গায় গ্রীক উপকথা ও বাইবেলের ৫০% জেরক্স কপি হলে ও নবির প্রতি আল্লাহ আরও বেশি স্নেহপরায়ণ। কিন্তু সমগ্র কোরান খুঁটিয়ে পড়লে দেখা যায় আল্লাহর পাঠানো প্রত্যাদেশ বা ওহিগুলি বেশ কিছু জায়গায় সাংঘর্ষিক এবং সব জায়গাতেই মুহাম্মদ এর সুবিধাভোগী এবং সব থেকে আশ্চর্যের যেটা এই ওহিগুলির বক্তা কে

মুহাম্মদ না আল্লাহ তা পরিষ্কার বোঝা যায়। এই নাজিল করা ওহিতে এক কথা বলছেন এবং পরেক্ষণেই ঠিক এর বিপরীত ওহি নাজিল করছেন। আর বেশ কিছু সুরার এমন সব আয়াত আছে যেগুলি পড়লে মনে হয় মুহাম্মদের নিজের বক্তব্য, কিছুতেই আল্লাহর প্রত্যাদেশ হতে পারেনা তা বাক্যের গঠন দেখলেই বোঝা যায়। মুহাম্মদ এভাবেই সারা কোরান ধরে নিজের বক্তব্য আল্লাহর নামে চালিয়েছেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি ------- সুরা আ-বাসা থেকে, আয়াত ১৩- ১৬

পরম করুণাময় পরম দয়াময় আল্লাহর নামে,

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লারই,

যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়াময় বিচার দিনের মালিক,

আমরা একমাত্র তোমারই উপাসনা করি,

তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি,

তুমি আমাদেরকে সঠিকভাবে চালিত কর সঠিক পথে

তাদের পথে যাদের তুমি অনুগ্রহ দান করেছ,

যারা তোয়ার রোষে পতিত হয়নি,পথভ্রষ্টও হয়নি।

এইটা কি আল্লাহর ওহি বা প্রত্যাদেশ হতে পারে? আল্লাহ কি নিজেই নিজের গুণগান করছেন? আল্লাহ কি নিজে নিজের উপাসনা করছেন বা করবেন? মোহের দ্বারা যারা আচ্ছন্ন নয় তারা এর সত্য মিথ্যা বুঝতে পারেন। এখানে নবিই আল্লাহ আর আল্লাহই নবি। আর যারা ধর্ম মোহের

দ্বারা আচ্ছন্ন তাদের কাছে কোরান ঐশী বাণী। ৯৯% মুসলমান কোরান পড়েন না, পড়লেও নিজেদের মস্তিষ্ককে বন্ধক দিয়ে আসেন মসজিদের ইমাম মুমিনদের কাছে।

সমগ্র কোরানের বেশকিছু আয়াত সাংঘর্ষিক। কোরানে আল্লাহ যুক্তিবুদ্ধির সীমা অতিক্রম করে গেছেন। সেখানে আল্লাহ ও বিভ্রান্ত, এই এক আয়াতে এক কথা আর কিছু পরেই তার বিপরীত কথা। কোরানের সব থেকে বেশী সুবিধাভোগী মুহাম্মদ। নবি ভাল মন্দ যা করেছেন তার সব কাজের শিলমোহর দিয়েছে কোরান। আল্লাহ মুহাম্মদের বিপরীত মতের লোকদের জন্য খড়্গহস্ত আর নবির জন্য পরম দয়ালু। নবীর অতিরিক্ত যৌন ক্ষিদে মেটানোর জন্য বিবিদের সাথে দ্বন্দ্ব হলেও আল্লাহ আয়াত নাজিল করেন নবির পক্ষেই। সংসারের মেয়েলি ব্যাপারেও তিনি এত আয়াত নাজিল করেছেন (সুরা তাহরিম / আহজাব) তাতে আশ্চর্য হতে হয়। নবির লুঠতরাজ এবং বানু কারজাই গোষ্ঠীর ইহুদীদের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিও সমর্থন জানিয়ে আল্লাহ নবির পক্ষেই আয়াত নাজিল করেন। গণিমতের মালের বন্টনেও আল্লাহ নবির পক্ষে, নবির অংশ ১/৫ ভাগ, বাকি মাল অন্যেরা ভাগ করে নেবে। সেখানেও নবিই সব থেকে বেশী সুবিধা প্রাপক।

আল্লাহর বক্তব্য কিভাবে সাংঘর্ষিক তার কিছু উদাহরণ কোরান থেকেই দেওয়ার চেষ্টা করছি। কোরানে

আল্লাহ সর্বস্রষ্টা, সর্বজ্ঞানী, সবজান্তা, সর্বশক্তিমান, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশ্রোতা, সব অভাব থেকে মুক্ত, করুণাময়, কর্তৃত্বব্যাঞ্জক, ক্রুদ্ধ, অভিশাপদাতা, হুমকি প্রদানকারী এবং ছলনাকারী (সুরা আনফাল ঃ আয়াত ৩০) ও প্রতিশোধ পরায়ণ (সুরা সাজদাহ্ আয়াত ২২, সুরা জুকরফের ৪১ ও ৫৫ নং আয়াত)। আবার আল্লাহ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু (১২ঃ ৯২)। আবার কেউ তার সাথে শরিক করলে তা হবে সম্পূর্ণ ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ (৪ঃ১১৬)। তিনি তার বান্দাদের প্রতি অবিবেচক হবেন না (৫০ঃ২৮)। অথচ দোজখের আগুনে পুড়িয়ে শাস্তি দেন। তিনি বলেন যখনই অবিশ্বাসীদের চামড়া দোজখের আগুনে পুড়ে যাবে তখনই আবার নতুন চামড়া জন্মাবে যাতে তারা অনন্তকাল কঠোর শাস্তি পেতে থাকে (১৮ঃ৫৫)। আল্লাহইতো সব বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসীদের স্রষ্টা, তাহলে উনিতো সবাইকে বিশ্বাসী করেই পাঠাতে পারতেন। তা না করে অবিশ্বাসীদের শাস্তি দেবেন কেন? মূল দোষী কে এখানে অবিশ্বাসী না আল্লাহ?

পরম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহতায়ালা যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন আর যাকে ইচ্ছা বিভ্রান্ত করেন (১৮ঃ১৭)। আবার পরেরক্ষণেই যারা বিভ্রান্ত হবে তাদেরকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। সুরা বাকারার ১০ ও ৯০ নম্বর আয়াত/ সুরা মায়িদার ৯৪ নং/সুরা তওবার আয়াত ৩৯। প্রশ্ন হচ্ছে আল্লাহ নিজেই বিভ্রান্ত করবেন আবার নিজেই কঠোর শাস্তি প্রদান করবেন? বিভ্রান্ত হওয়ার দায় কার?

একদিকে আল্লাহ সর্বশক্তিমান, আবার এক আয়াতে তার সাহায্যের প্রয়োজন হয়। (সুরা সাফফ, আয়াত ১৪)। মরিয়মের সন্তান ঈশা ----- আমরা ঈশ্বরের সাহায্যকারী। বা আমি মানুষের জন্য লোহা নাজিল করেছি যাতে মানুষের জন্য মহাশক্তি ও উপকার রয়েছে যাতে অদৃশ্য আল্লাহ জানতে পারেন কে তাকে ও তাঁর রসুলকে সাহায্য করেছেন? (সুরা আল হাদিদ – আয়াত ২৫)। যিনি সর্বশক্তিমান তিনি কী করে নগণ্য মানুষের সাহায্য চান? সর্বশক্তিমান কী করে নগণ্য আবু লাহাবের (মুহাম্মদের চাচা) মাথায় বজ্রপাতের অভিশাপের আয়াত নাজিল করেন? অদ্ভুত লাগে শত্রু কাকা নগন্য আবু লাহাবের প্রতি এত বিদ্বেষ যে আল্লাহ আবু লাহাবের নামে আল্লাহ একটা সুরা নাজিল করে পাঠালেন? নগণ্য আবু লাহাবের নামে একটা সুরা পর্যন্ত নাজিল হয় কেন? আবু লাহাবের স্ত্রী পর্যন্ত এই অভিশাপ থেকে বাদ যায়নি। শক্তিমান লোকেরা কি নগণ্য লোকদের অভিশাপ দেন? পুটিন ইউক্রেন আক্রমণ করে সঠিক না বেঠিক করেছেন সে প্রসঙ্গে যাচ্ছি না। উনি কি জেলেনেস্কিকে অভিসম্পাত করছেন? সুরা বালাদে ও সুরা হুমাজার (১০৪ নং আয়াতে) ওয়ালিদ আল মুগিরা এবং উমাইয়া বিন খালিদের প্রতি একই ধরণের হুমকিপূর্ণ অভিশাপ। কারণ মুহাম্মদের দুইপুত্র কাশেম ও তাহের মারা যাওয়ার পর ওয়ারেল মুহাম্মদকে লেজকাটা (উত্তরাধিকারহীন) বলে ঠাট্টা

করেছিলেন। এছাড়া নবি আল্লাহর রসুল, আল্লাহ নবির ছেলে কাশেম তাহেরকে বাঁচাতে পারলেন না?

বদরের যুদ্ধের পর কাব বিন আশরাফ নামে ইহুদী কবি হেরে যাওয়া পৌত্তলিকদের প্রতি সমবেদনা দেখালে এবং তাদের মুহাম্মদের উপর তাদের স্থান দিলে আল্লাহ ক্রুদ্ধ হয়ে সুরা নিসার ৫১-৫৭ আয়াত নাজিল করলেন। আবার সুরা হাশরেনবি যখন বানু নাজির নামে ইহুদী গোষ্ঠীকে হত্যা করে নির্মূল করলেন তখনও আল্লাহ নবির কাজের প্রশংসা করে হত্যাকারী নবির পক্ষে সমর্থন করে আয়াত নাজিল করলেন সুরা বানু নাজিরে।

আল্লাহ সারা ব্রহ্মান্ডের মালিক, তাঁর ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না। কিন্তু আল্লাহ সব সময়েই নবির পক্ষে। নবির উদ্দেশ্য বাস্তয়ায়নে বাধা দানকারীদের তিরস্কার করেছেন। যুদ্ধে জিতলে আল্লাহ জিতিয়েছেন আর যুদ্ধে নবি হারলে তিনি নিশ্চুপ। একদম সাধারণ কামুক মানুষের মতো কামুক নবি যৌনতা নিয়ে কুড়ি জন স্ত্রীদের সাথে সমস্যায় পড়লে মধ্যস্ততা করে নবিকে সুবিধা পাইয়ে দিয়েছেন। নবি পালিত পুত্র জায়েদের সুন্দরী স্ত্রী জয়নাবের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করেছেন আয়াত নাজিল করে। সুরা আহজাব/ সুরা তাহরিম এর সাক্ষ্য বহন করে।

আল্লাহ এই মহাবিশ্বের মালিক হলেও তিনি হিজরি ১-১১ হিজরি (৬২২-৬৩২ খ্রী) আল্লাহ নবির সাথে আরবের হেজাজ ও নেজদ অঞ্চলে বসবাস করতেন।

বিশ্বের অন্য অঞ্চলের কথা ভুলে গিয়েছিলেন। কোরানে ইউরোপ আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়া বা ভারতীয় উপমহাদেশ ও দঃপূর্ব এশিয়ার কথা নেই। কারণ নবির এই মহাদেশগুলির সম্পর্কে কোনও জ্ঞান ছিল না। আর আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার হয়েছে ১৫২৬ সালে।

নবি সবাইকে আল্লাহর পক্ষে যুদ্ধে যাওয়ার (জিহাদের) জন্য আরবীয়ানদের প্ররোচিত করেছেন। যা বর্তমানের মৌলবাদী মুসলিম সংগঠনগুলি করে। মুসলিমদের মধ্যে এইরকম ধর্মীয় শিক্ষার জন্যই টেরোরিস্ট বেশি। এটা ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্যই নবির শিক্ষা। যুদ্ধে অংশগ্রহণে অনাগ্রহ বা শৈথিল্য দেখালে তাদের দোজখের লেলিহান শিখার ভয় দেখিয়েছেন। আর যারা জিহাদে গেছে তাদের জন্য জান্নাতের তলদেশে নহর প্রস্তুত করিয়েছেন। এগুলো যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে পাঠ করলে নবি মুহাম্মদের সাথে আল্লাহর ফারাক করতে পারবেন?

নবির প্রতি কেউ উপহাস করলেও সঙ্গে সঙ্গে সুরা হিজরের ৯৫ নং আয়াতে নবিকে স্বান্তনা দেওয়া হল --- যারা বিদ্রুপ করে তাদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। সুরা আনফালের প্রায় পুরোটা জুড়ে বদরের যুদ্ধে মহান আল্লাহর গুণগান ও ভূমিকার কথা। আল্লাহ ফিকেল মাইন্ডেড, কারণ একটা আয়াত নাজিল করেই আবার পরেরক্ষণেই এর বিপরীত আয়াত নাজিল করেন। যেমন দেশের শত্রু নিপাত সম্পূর্ণভাবে না করা পর্যন্ত বন্দী রাখা কোনও নবির পক্ষে

সমীচীন নয় (আয়াত ৮ঃ৬৭)। কিছু পরেই আবার আয়াত (৮ঃ৭০) বলা হল, যুদ্ধবন্দীদের থেকে মুক্তিপণ আদায় করে মুক্ত করে দেওয়া হবে। মাত্র তিন আয়াতে পরিবর্তন, আল্লাহ বেশ খামখেয়ালী কিন্তু। যুদ্ধে জিতলে আল্লাহর অনুগ্রহে জিতেছেন। পরিখা বা খন্দকের যুদ্ধে বিজয়ের পর আল্লাহর গুণগান করে প্রচুর আয়াত নাজিল হয়। কিন্তু ওহুদের যুদ্ধে যখন মুসলমানদের শোচনীয় পরাজয় হয় এবং নবির প্রিয় চাচা হামজা বিন আব্দুল মোতালেব সহ সত্তর জন সাহাবি মৃত্যুবরণ করেন তার সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চুপ, এখানে আল্লাহর কোনও দায় নেই।

আল্লাহর মহাবিশ্ব যেন হেজাজে নেমে এসেছিল। কোরানের একাধিক আয়াতে হেজাজের সামাজিক অবস্থার বর্ণনা আছে। বিভিন্ন ঘটনা ও সংঘাত, বিতর্ক, রটনাকারীদের জবাব, ব্যক্তিগত ঝগড়ায় মধ্যস্ততা, মেয়েলি ব্যাপার, যুদ্ধের জন্য সনির্বন্ধ আহবান, মুনাফেকদের নিন্দা, যুদ্ধলব্ধ গণিমতের মাল, নারীর প্রতি নির্দেশ এবং অবিশ্বাসীদের দোজখের আগুনের হুমকি দিয়ে শত শত আয়াত আছে।

কোরানে স্রষ্টার মানবসুলভ গুণাবলী আছে। আল্লাহর রাগ, খুশী আনন্দ, ভালবাসা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, ষড়যন্ত্র করা, ছলনা, অভিসম্পাত করা, হুমকি দেওয়া সহ মানুষের সমস্ত গুণাবলী আছে। আসলে মানুষ নবি মানুষের আদলেই আল্লাহকে সৃষ্টি করেছেন। এটাই স্বাভাবিক মানুষ তার নিজের আদলেই ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে। আমরা অতীব ক্ষুদ্র

মানব, আমরা আশা করব মহাবিশ্বের স্রষ্টা নগণ্য মানুষের দোষগুণ থেকে মুক্ত থাকবেন। কিন্তু কোরান এর বিপরীত সাক্ষ্য দেয়। সেখানে নবিকে আর আল্লাহকে ফারাক করা যায় না।

গরীব নিরক্ষর অশিক্ষিত অল্প শিক্ষিত মানুষকে ধর্মের ওপরের অংশের লোকেরা নিজেদের সুবিধার্থে যা বোঝায় তাই বোঝে। কারণ অধিকাংশ লোক কোরান বা অন্য ধর্ম শাস্ত্র পাঠ করলেও তা যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে করে না, মোহ মুক্ত হয়ে করে না। আর এক ধরণের মানুষ আছে যারা ধর্মমোহের বিশ্বাসের ভাইরাসে আচ্ছন্ন, তার যুক্তিহীন বিশ্বাসের তাড়নায় আবেগতাড়িত হয়। তাদের যুক্তি প্রমাণ দিলে কোন কাজ হয় না। তবে একদম কিছু হয় না তা বলা যাবে না। বিশ্বে এখন সংশয়বাদী ও নাস্তিকের সংখ্যা ১৬% শতাংশে পৌঁছে গেছে। শুধু বাজে কথা নয় যুক্তি দিয়েই অবতারণা করতে হবে। ধর্মমোহ অন্ধবিশ্বাসের প্রাচীর ভাঙতে হবে তবেই এ বিশ্ব মানুষের বসবাসের উপযোগী হবে। নয় পাকিস্তান আফগানিস্তান হবে ...। আরও অনেক উদাহরণ দেওয়া যায়, কিন্তু তা লেখাকে দীর্ঘায়িত করবে, পড়ার ইচ্ছা চলে যাবে। তাই বলি কোরান গীতা বেদ যাই পড়ুন যুক্তিবুদ্ধি দিয়ে পড়ুন। সুরা ও আয়াতগুলি যুক্তির দ্বারা বিশ্লেষণ করুন।

(তথ্য : কোরান, সহি বুখারী, আলী দোস্তির মুহাম্মদের তেইশ বছর।)

বিজ্ঞান মনস্কতা কাকে বলে?

লি খে ছে ন – রূ প্সা দা স ভ ট্টা চা র্য



প্রায়শঃই আমরা দেখতে পাই বা শুনতে পাই কোথাও না কোথাও বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসারের জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠী নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সত্যিই কি বিশাল সংখ্যক মানুষ বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে উঠতে পারছে! না তো!

কেন বিজ্ঞান মনস্ক হয়ে উঠতে পারছে না, সে ব্যাপারে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, গোড়ায় গলদ।

যিনি নিজেকে বিজ্ঞানী বলে দাবি করছেন, তিনি নিজে কি আদৌ বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠতে পেরেছেন!

শুধু বিজ্ঞানকে একটা বিষয়(Subject) হিসেবে অনুশীলন করে পড়াশোনা, গবেষণা বা নতুন কিছু আবিষ্কার করে দেশবরেণ্য হলেই কিন্তু তাঁকে বিজ্ঞানী বলা হলেও বিজ্ঞানমনস্ক বলা যাবে না, যদি না তাঁর চিন্তা চেতনার মধ্যে যৌক্তিকতার প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়।

সমাজে আমরা এইরকম শিক্ষক, অধ্যাপক, গবেষক হিসেবে একটা বিরাট অংশকে দেখতে পাই যারা বিজ্ঞানকে শুধুমাত্র একটা লাভজনক বিষয় হিসেবে বিবেচনা করে। তারা এর মাধ্যমে প্রভুত অর্থ উপার্জন করে, ভোগ বিলাসবহুল জীবন যাপন করে। এইভাবে ক্ষুদ্র স্বার্থে বিজ্ঞানকে ব্যবহার করে মাত্র।

এদের চিন্তাভাবনায় বিজ্ঞানসম্মত যুক্তিবোধের লেশমাত্র থাকে না।

এরা বিজ্ঞানকে জীবিকার কাজে ব্যবহার করে আর ভাববাদী দর্শনের অনুসরন করে চলে।

এ হেন ব্যক্তিরা যদি বিজ্ঞানমনস্কতা প্রচারের কাজে নিযুক্ত হয়, মুখে বিজ্ঞানচর্চার বুলি অথচ পোশাকে - আশাকে সাজসজ্জায়, জীবনদর্শনে ভাববাদী হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ কিভাবে বিজ্ঞান মনস্ক হিসেবে গড়ে উঠবে?

তাই আমাদের সমাজে 'বিজ্ঞানমনস্কতা' প্রচার একটা প্রহসন মাত্র।

বিবেকানন্দতে আছি আবার মার্ক্সবাদেও আছি!

লিখেছেন – জিষ্ণু রায় চৌধুরী



ধর্মেও আছি আবার জিরাফেও আছি। এই সংস্কৃতি হলো এই বঙ্গে ছেপেমের মহৎ দান। বিবেকানন্দ সন্ন্যাস নিয়েছিলেন তাতে তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য থাকতেই পারে। কিন্তু

একজন হিন্দু বা মুসলিম বা খ্রিস্টান ধর্মের পথিকৃত যদি তাঁর ধর্ম অনুসারে চলেন তা বিজ্ঞানকেই অস্বীকার করে প্রতিষ্ঠা হওয়া অর্থাৎ বিজ্ঞান বিরোধী প্রগতিবিরোধী।

তাই ধর্মের মধ্যেই দ্বন্ধ প্রকট হতে বাধ্য নতুন নতুন উৎপাদনের হাতিয়ারের উদ্ভবের সাথেই সাথেই। তাই নতুন অর্থনীতি নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয়। সেই অনুসারে ধর্মের মধ্যেই অন্তরকলহ জেগে ওঠে। নতুন বেরিয়ে আসতে চায় পুরোনোর গর্ভ হতে।

এমনিতে ধর্ম বা ধর্ম গুরু দের কোনো মার্ক্সবাদী বা কোনো প্র্গতশীল বুর্জোয়ারাও কখনও গ্রহণ করতে পারেন না?

কিন্তু ধর্মের মধ্যেকার সংস্কার আন্দোলন ও কোনো প্রগতিশীল বিপ্লবকে মার্ক্সবাদীরা বিচার করেন শ্রদ্ধার সাথেই।

বিবেকানন্দ পরিষ্কার একজন হিন্দু ধর্মের সমস্ত ধর্মীয় সংস্কারকে স্বীকার করে নেওয়া ব্যক্তি। যদিও তাঁর মধ্যে দোদুল্যমানতা লক্ষ করা গেছে যেন তিনি নিজেই স্ববিরোধী হয়ে উঠেছেন তাঁর নিজের বক্তব্যের মধ্যে দিয়েই।

যেমন একদিকে তিনি শংকরাচার্জকেই এক নৃশংস হত্যাকারী হিসেবে প্রতিভাত করেছেন যিনি বৌদ্ধ শিষ্যদের হত্যা করেছেন আগুনে পুড়িয়ে আবার সেই তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের চালাকির সূত্র ধরে" বুদ্ধকে শিবের অবতার", হিসেবে ঘোষণা করছেন।

এই বিবেকানন্দ সতীদাহ প্রথার সমর্থন করেছেন। সেই বিবেকানন্দ প্রগতিশীল?

আপনি কাকে বেছে নেবেন,যুবকদের আইকন হিসেবে?

যে ভগত সিং তীব্র নিন্দা করেছেন যুবক যুবতীদের ঈশ্বরনির্ভরতার তাঁদের, তার জন্য কাপুরুষ আখ্যা দিয়েছেন।

তাঁকে কি তবে অস্বীকার করছেন?

আমরা মার্ক্সবাদ রা ধর্মমাত্র পরিত্যাজ্য জ্ঞান করি আবার চৈতন্য দেবের ভক্তি আন্দোলন এর বিপুল প্রশংসা করি কারন তিনি ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন ভারতের প্রগতির পথে বাধা কাস্টবাদকে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন। যদিও তাঁর আন্দোলন ছিল অহিংস। কিন্তু বাংলায় বাঙালির একদা প্রগতিশীল ভূমিকার পেছনে এই আন্দোলনের ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে এটা কি অস্বীকার করতে পারেন?

বিবেকানন্দ কী বলছেন?

তিনি বলছেন চৈতন্যদেব সমস্ত বাঙালিকেই নিরামিষাশী করে নপুংসক বানিয়েছেন। বাঙালিকে লড়াই বিমুখ করে তুলেছেন ইত্যাদি।

তিনি, কিন্তু চৈতন্যের ইতিবাচক লড়াই সম্পর্কে একটি উচ্চবাচ্য করলেন না কারণ তাঁর লড়াই হলো ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী।

বরং তাঁর শুধু নেতিবাচক দিকটি তুলে ধরলেন অর্থাৎ অহিংস আন্দোলনের ধারাকেই।

ইংরেজদের তৈরি ভারতবর্ষে কৃষক আন্দোলনে তাঁর একটি বাক্য ব্যয় হয়েছে কোনওদিন কোনওমুহূর্তে?

মাথায় রাখবেন বিদ্রোহ কখনো ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়েও শোভা পেতে পারে। কৃষক বিদ্রোহে সন্ন্যাসী আন্দোলন বা ফকির আন্দোলন একসময়ে তাঁদের চিহ্ন রেখেছিল।

তাই একজন সন্ন্যাসী বলেই তিনি এইসব ইংরেজবিরোধী ও জমিদারবিরোধী আন্দোলনের পক্ষে নীরব ছিলেন এমন অজুহাত শোভা পায় না। তিনি কিন্তু একটি রাও কখনো কারেননি, কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে।

কেন বলুন তো?

সূচিপত্র

বিভেদের বীজ ও স্থাপত্য ধ্বংস: বিজেপি ও বিবেকানন্দ

লি খে ছে ন – ত ন্ম য়



কিছুদিন আগে 'রাজপুত উত্তম সভা' আয়োজিত দশেরার অনুষ্ঠানে মিরাটের সারতানা বিধানসভার দুবারের প্রাক্তন বিধায়ক হিন্দু কট্টরপন্থী সঙ্গীত সোম বলেন,শুধুমাত্র একটি সম্প্রদায়ের জনসংখ্যা বাড়ছে এবং এটি বন্ধ করতে ভবিষ্যতে রাজপুত সম্প্রদায়কে হাতে অস্ত্র তুলে নিতে হবে। এই দাবি অবশ্য নতুন নয়। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী নেতৃবৃন্দ এই আহ্বান জানিয়েছেন।

'গণবাণী'তে প্রকাশিত 'হিন্দু মুসলমান' নামক একটি প্রবন্ধে কাজী নজরুল ইসলাম লিখেছিলেন,"..ন্যাজ যাদেরই গজায় তা ভেতরেই হোক বা বাইরেই হোক তারাই হয়ে ওঠে পশু।...মানুষ আর পশুতে পরিণত হয়েছে,তাদের চিরন্তন আত্মীয়তা ভুলেছে।...মনে হল পশুর ন্যাজ খসছে আর মানুষের গজাচ্ছে।"

বহুবছর আগে বিদ্রোহী কবি এই উক্তি করলেও তা আজও প্রাসঙ্গিক। চতুর্দিকে এই ন্যাজ গজানো রামভক্তের দল বিভেদের আগুনে মনুষ্যত্বের চিরন্তন আত্মীয়তাকে পুড়িয়ে ছারখার করে চলেছে।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন," মুসলমানগন যখন ভারতবর্ষে প্রথমে আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশি হিন্দুর বসবাস ছিল আর তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোনো প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরো কমিয়া যাইবে। শেষে আর কেউ হিন্দু থাকিবে না।...... অতএব ওঠো, জাগো, পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসারিত কর।"

বিজেপির তাত্ত্বিকেরাও একই ধারণা পোষণ করেন। তারা মনে করেন খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী।

তাই জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত রাখতে মৌলবাদ বিরোধী সাধারণ মানুষের চতুর্দিকে রচিত হল পরাধীনতার দেওয়াল। ক্ষমতার সার্চলাইট নিয়ম করে ঘুরতে শুরু করল। আমরা সকলেই নজরবন্দী হলাম।

ফরাসী দার্শনিক মিশেল ফুকোর মতে,আধুনিক মানুষ আইনের নিশ্ছিদ্র বেড়ার ভেতর জন্মগ্রহণ করে। মানুষের দেহ ও মন দুটোই সর্বক্ষণিক নজরদারি মধ্যে আইনি নিয়ন্ত্রণে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে।

আমরা অবরুদ্ধ, গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবাধিকার সব অবরুদ্ধ। কারণ ওরা সর্বক্ষণ নজর রাখছে।

ফুকো মনে করেন, ক্ষমতাতন্ত্রে বিচিত্রবিধি উপবিধি সন্দেহপ্রবণ পরিদর্শনের আওতায় স্কুল ব্যারাক হাসপাতাল ওয়ার্কশপ এর অবয়বে নজরদারির মধ্যে চলে আসে ব্যক্তির জীবন।

পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে শ্রমজীবী জনতা নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত এতো ঐতিহাসিকভাবেই সত্য। পাশাপাশি এটাও ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে পুঁজিবাদ যখন ফ্যাসিবাদের দিকে অগ্রসর হয় তখন চিন্তার জগতে অধ্যাত্মবাদ, ধর্মীয় উন্মাদনা, উগ্র জাতীয়তাবাদের স্টিমরোলার চালানো হয়।

আর এই উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং ধর্মীয় উন্মাদনা থেকে সংখ্যালঘুদের ওপর চলে নজরদারি। চলে আক্রমণ।

লেনিন আর স্তালিন এর দর্শন থেকে আমরা শিখি, পুঁজিবাদ তার প্রথম যুগে গণতন্ত্র এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার উপর যতটা গুরুত্ব আরোপ করেছিল, সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসে সেই পুঁজিবাদ এখন গণতন্ত্রকে,ব্যক্তি স্বাধীনতার গলা টিপে ধরছে। মিলিটারি এবং বুরোক্রেসির উপর নির্ভরশীল হচ্ছে। বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতার ঝান্ডা প্রতি মূহুর্তে পদদলিত কর্দমাক্ত করছে।

ফুকো বলেছেন, পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রতিটি মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে ওপর নজর রাখার জন্য নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য অসংখ্য প্রতিষ্ঠান বানিয়ে তোলে। এসব প্রতিষ্ঠান মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ ও রাজনৈতিক সমস্ত আচরণের কিছু মাপকাঠি নির্ধারণ করে দেয় সেই মাপকাঠি লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতে হয়।

গো-রক্ষা সমিতি, হিন্দু বহেন বেটি বাঁচাও সংঘর্ষ কমিটির মতো অসংখ্য প্রতিষ্ঠান তৈরী করেছে আরএসএস, বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তীব্র নজরদারি চালাচ্ছে

সংখ্যালঘুদের ওপর। মাপকাঠি লঙ্ঘন হলে নেমে আসছে শাস্তির খাড়া।

হিন্দু সমাজের ধর্মান্তকরণে আশঙ্কিত হয়ে স্বামীজি বলেছেন “এই দেখ না, হিন্দুদের সহানুভূতি না পেয়ে মাদ্রাজে হাজার হাজার পেরিয়া খ্রিস্টান হয়ে যাচ্ছে। মনে করিসনি কেবল পেটের দায়ে খ্রিস্টান হয়, হয় আমাদের সহানুভূতি পায় না বলে। অনাথ মেয়ে হাতে পড়লে তাদের আগে নিতে হবে। নইলে খ্রিস্টানরা সেগুলিকে নিয়ে যাবে।”

তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন,...আর কোনও লোক হিন্দু সমাজ ত্যাগ করলে সমাজে শুধু একটি লোক কম পড়ে তা নয় একটি করিয়া শত্রু বৃদ্ধি হয়।

শত্রু বৃদ্ধি কি কেউ কখনও চায়? হিন্দুত্ববাদীরাও চায়নি। তাই শুরু হল শত্রুদের ওপর আক্রমণ এবং প্রয়োজনে হত্যা।

হিন্দুদের ধর্মান্তরকরণ করে খ্রিস্টান করা হচ্ছে শুধুমাত্র এই সন্দেহে হিন্দু মৌলবাদী শক্তি বজরঙ দল পুড়িয়ে মারে গ্রাহাম স্টেইন্স এবং তার ৬ আর ১০ বছরের দুই পুত্রকে। মুসলমান ছেলেরা হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করে ধর্মান্তরিত করছে সন্দেহে খোলা হয় একটি হেল্পলাইন। একটি ফোন নাম্বার দিয়ে হিন্দুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে আসা হয়

এমন ঘটনা ঘটলেই যেন হেল্পলাইনে জানানো হয়। আরএসএস ফয়সালা করবে।

সংবিধানকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মেয়েদের মনে ভীতির সৃষ্টি করা হল। নিজে পছন্দ মত বিয়ে নৈব নৈব চ। চলল কড়া নজরদারি।

ফ্রিজে গরুর মাংস রাখার অভিযোগে মহম্মদ আখলাখকে বাড়িতে ঢুকে পিটিয়ে মারা হল। গুরুতর আহত হলেন তার মা ও সন্তান। শ্রমিক মোহাম্মদ আফরাজুলকে রাজস্থানে পুড়িয়ে খুন, গোরক্ষকদের তাণ্ডবে পহেলু খান বা উমের খানের মৃত্যু, হরিয়ানায় কিশোর জুনেইদ খানকে ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে হত্যা, ট্রাকে করে গোমাংস নিয়ে যাওয়ার অভিযোগে জম্মু কাশ্মীরে উধমপুরে ট্রাক ড্রাইভার জাহিদ রসুলকে নৃশংস নিধন করা হল। হিমাচল প্রদেশ,হরিয়ানা সহ প্রায় সারা দেশে বিশেষ করে ভাজপা যেসকল রাজ্যে ক্ষমতায় আছে সেইসকল রাজ্যগুলিতে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ধ্বংস হতে শুরু হল মনুষ্যত্ব, মানবতা।

ভারতে মুসলিম, খ্রিস্টান এর মতো সংখ্যালঘুরা যেভাবে ক্রমাগত আক্রান্ত হচ্ছে সেটা বিবিসি বাংলাকে স্পষ্টভাবে বলেছিলেন মহারাষ্ট্রের সাবেক পুলিশ প্রধান মীরন বোরওয়ানকার।

তিনি বলেছিলেন,"ইদানিং আমি অনুভব করছি সংবিধান যে সবাইকে নিয়ে চলার কথা বলে তা এদেশে তা মানা হচ্ছে না। সংখ্যালঘু সমাজ যে অস্বস্তিতে আছে সেটাই তো দেখা যাচ্ছে। তাদের উপর হামলা হচ্ছে কিন্তু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীও তাদের সাহায্য করছে না।

“ইয়ে তো স্রেফ ঝাঁকি হ্যায়,কাশী মথুরা বাকি হ্যায়।” সংখ্যাগুরুবাদের আধিপত্য কায়েমের উদ্দ্যেশ্যে ক্ষমতার আস্ফালনে উন্মত্ত করসেবকদের দ্বারা বাবরি মসজিদ গুড়িয়ে দেওয়ার পর হিন্দুত্ববাদীদের নগ্ন উল্লাস।

কাশ্মীর ভ্রমণকালে ক্ষীর ভবানী মন্দির দর্শনের পর স্বামীজী তার মনের ভাব যে বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শিষ্যার কাছে প্রকাশ করেছিলেন সেটা হল -"মা ভবানী এখানে সত্যই কতকাল ধরিয়া প্রকাশিত রহিয়াছেন। পুরাকালে যবনেরা আসিয়া তাহার মন্দির ধ্বংস করিয়া যাইল অথচ এখানকার লোকগুলো কিছু করিল না। তাই আমি যদি থাকিতাম তবে কখনো উহা চুপ করিয়া দেখিতে পারিতাম না।”

চুপ করে বসে ছিলেন না হিন্দুত্ববাদীরা। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুত্ববাদীদের পক্ষ থেকে দাবি উঠল যে

ষোড়শ শতাব্দীতে বাবরের আমলে যেখানে মসজিদ গড়া হয়েছে সেই অযোধ্যায় বহুকাল পূর্বে বাবরি মসজিদের জায়গায় রামের মন্দির ছিল। তাই মসজিদ ভেঙে রামের মন্দির গড়ার সলতে পাকানো শুরু করেছিলেন স্বাধীনতার আগে থেকেই। শুধু অপেক্ষা করছিলেন অনুকূল সময়ের।

মৃত্যুকে উপেক্ষা করে ধর্মরক্ষার তাগিদে স্বামীজি বলেছিলেন "তোমরা যে শত শতাব্দীর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া আছো, তাহার কারণ তোমরা সযত্নে এই ধর্মরক্ষা করিয়াছো। এই ধর্মরক্ষার জন্য তোমাদের পূর্বপুরুষগণ সাহস পূর্বক সকলই সহ্য করিয়াছিলেন এমনকি মৃত্যুকে পর্যন্ত আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত ছিলেন। বৈদেশিক বিজেতাগণ আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভাঙিয়াছে কিন্তু এই অত্যাচার স্রোত যেই একটু বন্ধ হইয়াছে আবার সেখানে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে।"

স্বামীজী আরও বলিয়াছেন,"অনেক গ্রন্থপাঠের যাহা না শিখিতে পারো, সোমনাথ মন্দিরের মত দাক্ষিনাত্যের অনেক প্রাচীন মন্দির তোমাদিগকে অধিকতর শিক্ষা দিতে পারে, তোমাদের জাতির ইতিহাস সম্বন্ধে গভীরতায় অন্তর্দৃষ্টি দিতে পারে। লক্ষ্য করিয়া দেখো, ওই মন্দির শতশত আক্রমণের ও শতশত পুনরুত্থানের চিহ্ন ধারণ করিয়া আছে, বারবার নষ্ট হইতেছে, আবার সেই

ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্থিত হইয়া নূতন জীবন লাভ করিয়া পূর্বের মতো অচল অটলভাবে বিরাজ করিতেছে।

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ রামমন্দির সম্পর্কে একই মত পোষণ করে। হিন্দুত্ববাদী এই সংগঠনের মতে শ্রীরাম অযোধ্যায় অচল অটলভাবে বিরাজ করছেম, কিন্তু পূর্বের মত নয়। শ্রীরাম মন্দির সেখানেই নতুন জীবন লাভ করবে। ভব্য রাম মন্দির নির্মাণ শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

অনুকুল সময় আসতেই এক মূহুর্ত সময় নষ্ট করেনি রামভক্ত হনুমানেরা। দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি শেষে জয় শ্রীরাম' হুঙ্কার ছেড়ে ১৯৯২ সালের ৬ ই ডিসেম্বর মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল ঐতিহাসিক সৌধ বাবরি মসজিদ।'

ধর্ম রক্ষা করেছিল রাম ভক্তরা। বাবরি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ হইতে উত্থিত হয়ে রাম মন্দিরের নতুন জীবন লাভের প্রক্রিয়া শুরু করেছিলেন।

গভীর আক্ষেপের সাথে বিবেকানন্দ বলেছিলেন "যদি তুমি অন্য কোনও দেশে গিয়া মুসলমানদিগকে বা অন্য ধর্মাবলম্বীগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির নির্মাণ করিয়া দিতে বল, দেখিবে তাহারে কিরূপ সাহায্য করে। তৎপরিবর্তে তোমার মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে

তোমার দেহমন্দিরটিও ভাঙিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিবে। এই কারণেই পৃথিবীর পক্ষে এই শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন.. ভারতের নিকট পৃথিবীতে এখনো বড় পরধর্মসহিষ্ণুতা শুধু তাহাই নয়,পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি শিক্ষা করিতে হইবে।”

ধর্মীয় রাষ্ট্রের জিগিরে মাতোয়ারা মৌলবাদীদের কাছে পরধর্মের প্রতি গভীর সহানুভূতি অর্থাৎ পরধর্মসহিষ্ণুতা নিছক কথার কথা। ধর্মীয় উন্মাদনা থাকবে,অস্ত্রের ঝনঝনানি থাকবে কিন্তু সন্ত্রাসের লেশমাত্র থাকবে না এটা সোনার পাথরবাটি। হিন্দুর শত্রু মুসলিম আর মুসলিমের শত্রু হিন্দু এই প্রকার সাম্প্রদায়িক প্রচারের মধ্য দিয়ে ধর্মীয় বিরোধের সৃষ্টি দীর্ঘদিন ধরে করে চলেছে হিন্দুত্ববাদী শক্তি।

ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যে আরএসএস, বিজেপি, বজরং দল থেকে শুরু করে দেশের বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী শক্তি সর্বশক্তি প্রয়োগ করে উগ্র মুসলিম বিদ্বেষী মানসিকতার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে।

১৯২২ সালে হিটলার একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন- "একজন খ্রিষ্টান হিসেবে ঈশ্বর তথা পরিত্রাতাকে আমি একজন যোদ্ধার রূপে দেখতে পাই। আমি দেখতে পাই এমন এক মানুষকে তিনি একদা একাকী অল্পকিছু অনুচর

পরিবৃত হয়ে ইহুদীদের চিহ্নিত করেন এবং তারপর বহু মানুষকে একত্রিত করে ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্ররোচিত করেন এবং যিনি ঈশ্বর সাক্ষী, দুঃখভোগী নন, বরঞ্চ একজন মহান যোদ্ধা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। খ্রিষ্টধর্মের একান্ত অনুরাগী হিসেবে এবং একজন মানুষ হিসেবে আমিই সেই অংশটি পড়ি যেখানে প্রভু অবশেষে শক্তিশালী রূপ পরিগ্রহ করছেন আর চাবুক হাতে নিয়ে ঈশ্বরের মন্দির থেকে শয়তানদের কশাঘাত পূর্বক বিতাড়ন করছেন। ইহুদি বিষের বিরুদ্ধে কী সুমহান সেই যুদ্ধ। আজ ২ হাজার বছর পরেও তীব্র আবেগ মথিত করে আমি আরও গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারছি যে এই কারণেই তাকে ক্রুশের উপর রক্ত ঝরাতে হয়েছে। একজন খ্রিষ্টান হিসাবে আমি নিজেকে ধোকা দিতে পারি না।সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করার দায় আমার উপরেও বর্তায়।"

হিটলারের এই বক্তব্য থেকে যিশুর জায়গায় রাম,ইহুদির জায়গায় মুসলমান এবং খ্রিস্টধর্মের জায়গায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম বসালেই কি অদ্ভুত মিল পাওয়া যায় সেকালের হিটলার মুসোলিনির সাথে একালের আরএসএস,বিজেপির।

মহাকাব্যের রাম হিন্দুত্ববাদীদের হাত ধরে প্রবেশ করেন রাজনীতির মহাকাব্যে। ফ্যাসিস্ট রাজনীতির আঙিনায় নাৎসিবাদীদের যিশু আর হিন্দুত্ববাদীদের রাম মিলেমিশে একাকার।

ধর্মের গণ্ডি পেরিয়ে জয় শ্রীরাম হয়ে ওঠে একটি রাজনৈতিক স্লোগান। এক পৌরাণিক চরিত্র 'রাম'কে নিয়ে উন্মাদনা সৃষ্টি আসলে আমাদের দেশে সংখ্যাগুরু আধিপত্যকারী ধর্মীয় গোষ্ঠীর আধিপত্যবাদ। সংখ্যালঘু বা অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে দমন করার এক ফ্যাসিস্ট কৌশল।

ফ্যাসিস্ট সরকারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় ধ্যান-ধারণা বিস্তারের মাধ্যমে ধর্ম ও রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য তার জনমত তৈরি করা।

বিবেকানন্দের মতানুসারে,আমাদের ধর্মই আমাদের তেজ,বীর্য,এমনকি রাষ্ট্রিয় জীবনের মূল ভিত্তি। আমি এখন এই বিচার করিতে যাইতেছি না যে,ধর্মেই আমাদের রাষ্ট্রিয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন করার পরিণামে আমাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ হইবে;ভালো হউক বা মন্দ হউক,ধর্মে আমাদের রাষ্ট্রিয় ভিত্তি রহিয়াছে,তোমরা উহা ত্যাগ করিতে পার না। চিরকালের জন্য উহাই তোমাদের রাষ্ট্রিয় জীবনের ভিত্তিস্বরূপ রহিয়াছে,সুতরাং আমাদের ধর্মে আমার যেমন বিশ্বাস আছে,তোমাদের যদি তেমন নাও থাকে,তথাপি তোমাদিগকে এই ধর্ম অবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। তোমরা এই ধর্মে বন্ধনে চির আবদ্ধ। যদি ধর্ম পরিত্যাগ করো তবে তোমরা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবে। ধর্মই আমাদের জাতির জীবনস্বরূপ, ইহাকে দৃঢ় করিতে হইবে।

ইতালির পুনর্জাগরণের আধ্যাত্মিক শক্তি,ঐক্য আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ম্যাৎসিনিরও চিন্তাধারা ছিল ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির মিশিয়ে দেওয়া। ইতালির একত্রীকরণ হওয়ার সময়ে তিনি বলেছিলেন যে ধর্ম ছাড়া কোনও জাতীয়তাবাদ বা রাজনীতি সফল হবে না।

হিটলার,মুসোলিনি,গোয়েবলস,ম্যাৎসিনি প্রমুখেরাই তো আরএসএস ও বিজেপির পথপ্রদর্শক।তাই ধর্মের সাথে রাজনীতির একত্রীকরণের ভাবনা তাদের মতাদর্শের মধ্যে নিহিত।

পুঁজি আর শ্রমের দ্বন্দ্বকে ভুলিয়ে এই রাজনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য এক ধর্ম রাষ্ট্র সৃষ্টির পরিকল্পনা।

সেই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করতেই লাগাতার এবং লাগামছাড়া বিভেদের বীজ বপন এবং স্থাপত্য ধ্বংসের কর্মসূচী।

সূচিপত্র

শিব রাত্রি পালন করা নারী জাতির কলঙ্ক নয় কি?

লি খে ছে ন – সৌ রা ষ্ট্র দা শ



নারীরা এতো ভক্তি সহকারে এতো নিষ্ঠা ও উন্মাদনার সাথে যে শিব-রাত্রি পালন করে, তার ইতিহাসটা কি তারা জানে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস তারা যদি শাস্ত্রগ্রন্থগুলি পড়ত বা জানত তাহলে এতো অশ্লীল-অসভ্য-বর্বর কর্মটি তারা কিছুতেই করতে পারত না। যে সব নারীরা শিব পূজা বা

শিবরাত্রি পালন করে তাদের উদ্দেশ্যে আমার বক্তব্য, আগে ধর্মশাস্ত্রগুলি পাঠ করুন, তারপর যদি রুচিতে বা সম্মানে না লাগে তবে শিবরাত্রি পালন করুন।

এবার জানুন শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে শিবের চরিত্র সম্পর্কে বা শিবরাত্রি পালন সম্পর্কে কি ইতিহাস আছে----- শিবের চরিত্র সম্পর্কে বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থে বিভিন্ন রকম বর্ননা থাকলেও কাহিনী বা ঘটনা ধারা মোটামুটি প্রায় একই রকম।

শিব সম্পর্কে বর্ননা পাই ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, মার্কন্ডেয় পুরাণ, গড়ুর পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ, নারদ সংহিতা, শিব উপাখ্যান, শিবায়ন ---- মূলত এই কয়েকটি গ্রন্থে।

এই গ্রন্থগুলিতে যেরকম বর্ণনা পাই তা হল, শিব অত্যন্ত কামুক, দুশ্চরিত্র, ব্যভিচারি, নেশাগ্রস্থ, অপরিচ্ছন্ন, বিকৃতি রুচির। সর্বদা গাজায় আসক্ত থাকে।

দিনের বেলায় "কুচনি" নামক বেশ্যা পল্লীতে সে পড়ে থাকে। তার দশ সহস্রাধিক উপপত্নী রয়েছে।

এই নিয়ে তার সর্বক্ষনের গৃহবিবাদ। সন্ধ্যার পরে চিতার ছাই মাখিয়ে, গাজায় টান মেরে শ্মশানে পড়ে থাকে।

অধিকাংশ রাতেই বাড়ি ফেরে না। কখনো কখনো মৃতের পচাগলা মাংস ভক্ষন করে।

পোশাক বলতে দিনের বেলায় শুধু কোমরে বাঘের ছালটুকু,আর রাতে উন্মাদ -- বস্ত্রহীন।

ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে শিবলিঙ্গ পূজা বা শিবরাত্রি পালন সম্পর্কে যে কাহিনী পাই তা এতোটাই অশ্লীল-কদর্য, যা বর্ননারও অযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর "উপনিষদের ভাষ্য" গ্রন্থে এই বর্ণনা সম্পর্কে বলেছেন - "ইহা রতিশাস্ত্রকেও হার মানাইয়া দেয়, - এতটাই কুরুচিসম্পন্ন" (পাতা- ৯৬, পঞ্চম সংস্করন)।

অতি সংক্ষেপে কাহিনীটি হলো -"কামাতুর শিবের কামনার আগুন থেকে সতীত্ব-নারীত্ব বাঁচাতে সমস্ত নারীরা স্বর্গ ছেড়ে পালাতে থাকে। দিন-ক্ষণ নেই, নেই স্থান-কাল-পাত্রীর বিবেচনা। শিবের সম্মুখে পড়লেই তাদের রক্ষে নেই।

এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে সমস্ত নারীরা ব্রহ্মার কাছে গেল। ব্রহ্মা তাদের কোনও পরামর্শ না দিতে পেরে বিষ্ণুর কাছে পাঠিয়ে দেয়।

অবশেষে বিষ্ণুর কাছে গেলে তিনি নারীদের পরামর্শ দিয়ে বলে, যখন শিব তাদের নারীত্ব হনন করবে তখন শিবের লিঙ্গ ছেদ করে দিতে হবে এবং ঐ ছেদ করা লিঙ্গকে বেলপাতা দিয়ে ঢেকে রেখে শান্ত করবে ----- তবেই শিবের কামনাকে দমন করা যাবে।

বিষ্ণুর কথামতো নারীরা একদিন অতি সুকৌশলে ও গোপনে শিবের লিঙ্গ (যৌনাঙ্গ) কেটে নেয়। কিন্তু কিছুতেই শিব লিঙ্গকে শান্ত করা যাচ্ছে না।

এমতাবস্থায় নারীরা পুনরায় বিষ্ণুর কাছে গেলে সে পরামর্শ দিয়ে বলে যে, এই কাটা লিঙ্গ শীল-নড়া দিয়ে থেঁতলে বেলপাতা দিয়ে চাপা দিতে হবে।

এভাবে অবশেষে শিবলিঙ্গ শান্ত হয় এবং শীল-নড়া দিয়ে থেঁতলে দেওয়ার ফলে শুধু বীর্য-দ্বার টুকু অক্ষত থাকে " (সূত্র -- ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ, দেবদেবীর জন্মবৃত্তান্ত খন্ড, চতুর্থ সংস্করন, গীতা প্রেস, পাতা- ১৫৮ থেকে ১৬২, ১৬৬ থেকে ১৭২, ১৭৪)। পরবর্তীকালে শিবের এই বীর্য-দ্বারের পূজা করা হয়।



মার্কন্ডেয় পুরানের মৎস খন্ডে শিব সম্পর্কে আমরা জানতে পারি ---" পাঁচ-ছয় দিবস শঙ্কর বাড়িতে না ফিরলে উমা কুচনি পাড়ার পতিতালয় হইতে লোক দিয়া ধরিয়া আনিবার আজ্ঞা দিতেন "(ষষ্ঠ সংস্করন, সত্যম পাবলিকেশন্স, পাতা- ২১৮)। "শিবায়ন" গ্রন্থে মাতাল শিবের একটি চমৎকার বর্ণনা পাই - "গাজার নেশায় শিবের দু'চোখ ঢুলুঢুলু, দু'পা টলছে, সারা গায়ে ছাইভস্ম

মাখানো, শ্মশান থেকে পথ চিনে আসতে পারছে না, পাড়া প্রতিবেশীর বাড়িতে ঢুকে পড়ছে।

অবশেষে প্রায় ভোর রাতে বাড়ি ফিরে স্ত্রী উমার পা ধরে মা মা বলে কাঁদতে শুরু করে "(বাংলায় অনুবাদ - দ্বিজ মাধব, দ্বিতীয় সংস্করন, পাতা- ৬১)। বিষ্ণুপুরাণের দক্ষযজ্ঞ পর্বে শিবের সঙ্গে সতীর বিয়ের সময়ের একটি মজার বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহলো - শিব বিয়ে করতে গিয়েছে।

কোমরে শুধু বাঘের ছাল, আর বেল্ট হিসেবে জড়ানো রয়েছে সাপ। শিব বিয়ের পিড়িতে বসলে শালিকারা মজা করার জন্য সাপের মাথায় গাছড়া ধরলে সাপ শিবের কোমর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে শিবের কোমর থেকে বাঘের ছাল পড়ে যায়। আর কি, শাশুড়ির সামনে ল্যাংটো শিব।

শিব সম্পর্কে এই হলো ধর্মগ্রন্থগুলির বর্ণনা। যে সব নারীরা শিবরাত্রি পালন করেন বা শিবলিঙ্গ পূজা করেন এবার তাদের কাছে আমার প্রশ্ন - আপনারা কি শিবের মতো পুরুষ স্বামী হিসেবে পেতে চান? আসলে ব্রাহ্মন্যবাদী সিস্টেমে আপনারা ব্রাহ্মন্যবাদের ক্রীতদাসী হয়ে বেঁচে আছেন।

তাই ভালো মন্দকিছু বিচার না করে, ইতিহাস না জেনে, শুধু অন্ধভক্তিতে ডুবে আছেন - সেখানে যুক্তি-তর্ক, বিদ্যা-বুদ্ধি সব অচল।

তাই৮তো অশিক্ষিতা থেকে শুরু করে B.A., M.A. পড়া মেয়েরা, স্কুল-কলেজের শিক্ষিকা, ডাক্তারি-ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ মেয়েরাও এই অন্ধ কুসংস্কারে ও অন্ধ ভক্তি বিশ্বাসে মেতে আছেন। এর বাইরে কিছু ভাবতেই চায় না তারা।

শিবরাত্রি পালন করব, অথচ স্বামী মদ-গাঁজা খেলে দুশ্চরিত্র - লম্পট হলে এতো রাগ-অশান্তি করা হয় কেন? আর এই ইতিহাস জানার পরেও যদি কোনও মেয়ে শিবরাত্রি পালন করে, তবে আত্মমর্যাদাহীন, জ্ঞান-বুদ্ধিহীন, অন্ধ কুসংস্কারগ্রস্থ নারী বলা উচিৎ নয় কি? পাথরের শিবলিঙ্গে হাজার হাজার বালতি দুধ না ঢেলে ঐ দুধ ক্ষুধার্ত শিশুকে খাওয়ানো অনেক অনেক ভালো কাজ নয় কি? হে নারী জবাব দাও।

সূচিপত্র

আস্তিক-নাস্তিক

লিখেছেন – বুবাই মান্না



অনেকদিন আগের ঘটনা! একজন মুসলিম বাড়ির বউ আরেকজন হিন্দু বাড়ির বউ একই দিনে একই হসপিটালে বাচ্চা প্রসবের দিন ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু ওইদিন ইলেক্ট্রিক না থাকায়, অন্ধকারে ২ পরিবারের বাচ্চা অদলবদল হয়ে যায়। ২টো বাচ্চা পুত্র সন্তানই ছিলো। সেই থেকে মুসলিম বাড়ির ছেলে হিন্দু বাড়িতে আর হিন্দু বাড়ির ছেলে মুসলিম বাড়িতে রীতিমত বড়ো হয়। একটা সময় পর, তারা বিয়ে করে সংসার জীবন

করে। ২ জনের পরিবার খুব খুশি এই ভেবেই যে ওরা যে যার নিজ নিজ ধর্মে একটুও আঘাত ঘটায়নি। ধর্মের প্রতি দুই পরিবার একদম অটুট। শিবের মাথায় জল ঢালা থেকে ঈদের আগে ১ মাস রোজা রাখা ইত্যাদি যে যার ধর্মী কাজ খুশি মনে করে যাচ্ছেন আর এটাই ভাবছেন যে ভগবান কিংবা আল্লাহ যে যার পরিবার কে বাঁচিয়ে রাখছে, পরিবারের মঙ্গল করছে ইত্যাদি। একদিকে মুসলিম ছেলের পরিবার (আসলে ওনারা হিন্দু) খুশিতে গরুর মাংস খাচ্ছে, আরেকদিকে হিন্দু ছেলের পরিবার (আসলে ওনারা মুসলিম) খুশিতে জবাই না করে চিকেন খাচ্ছে কিংবা শুকরমাংস খাচ্ছে। কিন্তু কারোর কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। কারোর মনের মধ্যে কোনো ধর্মীয় ভয়ও নেই। কে আস্তিক আর কে নাস্তিক? মুসলিম ছেলেটা আস্তিক যে হিন্দুরীতি মেনে চলছে নাকি হিন্দু ছেলেটা যে মুসলিমরীতি মেনে চলছে? নাকি দুটো পরিবার নাস্তিক?

সমস্যাটা ওখানেই। মানুষের মনের মধ্যে সমস্যা। মনের সমস্যা। মানুষ যদি ভেবে নেয় যে হিন্দু গরুর মাংস খেলেই বিপদ ঘটবে তাহলে নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু ঘটনা ঘটলে প্রথমে ওটাই মনের মধ্যে আসে যে সেদিন গরুর মাংস খেয়েছিলো বলেই আজকে এমন অঘটন ঘটল, কিন্তু শুধুমাত্র গরুর দুধ খেলে এমন ঘটনা হতনা। ঠিক

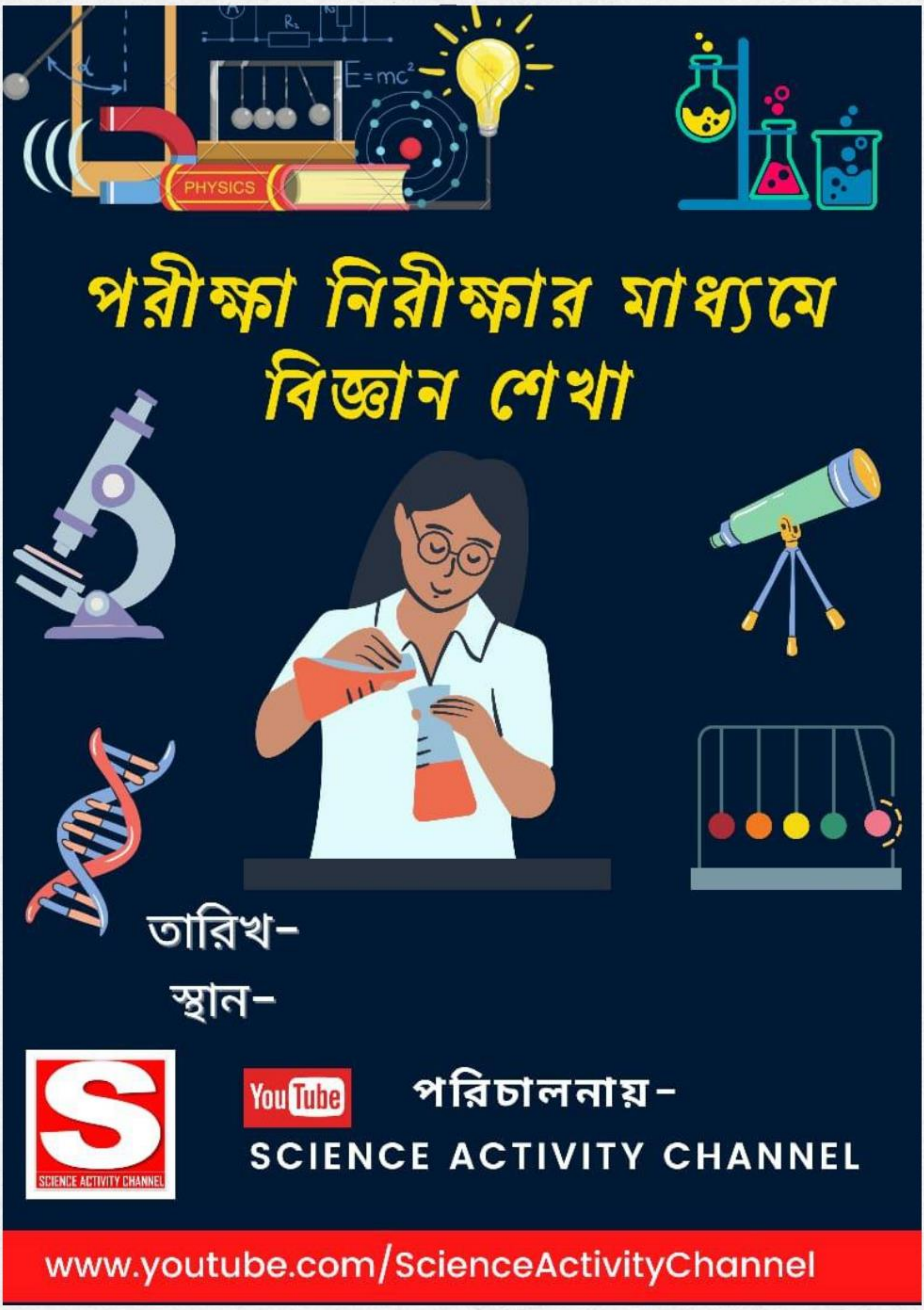
মুসলিমদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার যে হালাল করে মাংস খায়নি তাই অঘটন ঘটল কিংবা রোজা রাখেনি তাই হয়েছে, কিংবা শুকরমাংস খেয়েছিল বলে ইত্যাদি ইত্যাদি।

পাকিস্তানে কত হিন্দু কে জোর করে মুসলিম ধর্মে রূপান্তর করা হয়েছে। সেই হিন্দুরা বুঝি আজ হিন্দুর ভগবানের থেকে অভিশাপ পেয়েছে? ১৯৭১ সালে দেশ ভাগের আগে বাংলাদেশে কত হিন্দুকে জোর করে মুসলিম করা হয়েছে, তাদের বুঝি এখন হিন্দুদের ভগবান থেকে অভিশাপ পেয়ে জীবন ধ্বংস হয়ে গেছে?

পৃথিবী সৃষ্টির আগে প্রাণের অস্তিত্ব ছিলোনা। তারপর ধীরে ধীরে ৮.৭ মিলিয়ন প্রজাতি দেখা যাচ্ছে। তাদের মধ্যে মানুষ একটা প্রজাতি। পরিবর্তন হচ্ছে। কত প্রজাতি বিলীন হয়ে গেছে। আবার কত নতুন প্রজাতি এসেছে। ডাইনোসর পৃথিবী থেকে উধাও হওয়ার আগে মানুষের উৎপত্তি ছিলোনা। তখন বুঝি মানুষরূপী ভগবানের পরিবর্তে ডাইনোসররুপী ভগবান ছিলো? তারপর সেই ডাইনোসররুপী ভগবান ডাইনোসর প্রজাতিকে নিষ্পত্তি ঘটালো? তারপর মানুষের প্রজাতি এলো। সেটা ঠিক মানুষ না। বানর এলো। পরিবর্তনের ধারায় সেই বানর আজকে মানুষে পরিবর্তন হয়েছে। ধীরে ধীরে মানুষের ও পরিবর্তন হচ্ছে। মানুষদের চেহারার পরিবর্তন আসছে। সব কিছুর

পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তনের মাঝে কিন্তু সবাই বসবাস করছে। কতদিন? কতদিন বসবাস থাকবে? একটা মানুষের ক্ষেত্রে সেটা প্রায় ১০০ বছর। অন্যপ্রাণীরা এটাও জানেনা যে তারা কতদিন বাঁচে! এটাও জানেনা যে একদিন মানে আসলে কি? "ওহ পৃথিবী তার নিজের চারদিকে একবার লাট্টুর মত ঘোরা?" আচ্ছা এই ব্যাপার! কিন্তু পৃথিবী কি জিনিষ? এটাও জানেনা। ওদের জানার দরকারও পড়েনা। ওদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে বাসস্থান, আর খাদ্য। আর কিছু দরকার পড়েনা। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি বেশি। "ওরা যত বেশি জানে, তত কম মানে"। আর কম মানছে বলেই এত সমস্যা। তাই মানুষ আজ নিজ নিজ দেশ বানিয়েছে, নিজ নিজ বাসস্থান থেকে শুরু করে সব কিছু বানিয়েছে। মেডিক্যাল সাইন্স, টেকনোলজি ইত্যাদির ব্যাবহার শুরু করেছে। অনেক সময় লেগেছে ঠিকই। আরো লাগবে। কিন্তু যাই করুক না কেনো এই পৃথিবীর বুকেই হচ্ছে। সেই গোলাকার বস্তুটার ওপরেই হচ্ছে। আমরা কিন্তু সেই একটা প্রজাতি। "প্রজাতি"। ভগবান না। ভগবান - আল্লাহ আর বাকি সব ধর্মের ভগবান বলে কেউ নেই। ছিলো না। থাকতে পারেনা। মানুষের মধ্যে অলৌকিক শক্তি থাকতে পারেনা। মানুষ আরো ৫টা প্রাণীর মতোই, আরো ৫টা প্রজাতির মতোই। মানুষ ভগবান্ হলে মানুষের অস্তিত্ব সবার আগে হতো। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে সবার থেকে মানুষের শুধু বুদ্ধি বেশি। আর বুদ্ধির জোরেই এতো কিছু গড়ে

উঠেছে আর তার সাথে সাথে আজ নানান ধরনের ধর্মের ভগবানের আবির্ভাব ঘটিয়েছে মানুষ। এটাও একটা ব্যবসা। এই বিশ্বে ধর্ম নিয়ে সব থেকে বেশি ব্যাবসা চলছে এখন। মানুষ না খেতে পেলেও, টাকার অভাবে ছেলে পুলেকে পড়াশুনা না করতে পারলেও ধর্মের নামে যে মানসিক আছে সেটা সেই টাকা খরচ করে শোধ করেন। আর সেই জন্যই, মানুষ জন্ম নিলেই তাকে ধর্মের ইনজেকশন দেওয়া হয়। আর তখন থেকেই সে নিজ নিজ ধর্মের প্রতি গোড়ামি শুরু করে, কিন্তু সেই ইনজেকশনটা অন্যকোনো ধর্মের হলে তখন অন্যধর্মের গোড়ামি করতো ঠিক যেমন হিন্দু মুসলিম বাড়ির বাচ্চা অদলবদল হওয়ার ঘটনা।



কোনওরকম খরচাপাতি ছাড়াই বিভিন্ন বিদ্যালয় যোগাযোগ করতে পারে।

পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে -

গোপাল মন্ডল

বিজ্ঞান শিক্ষক

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান মনস্কতা প্রসার কর্মী

যোগাযোগ- 9635-578-948

সূচিপত্র

প্রসঙ্গ যখন ‘বিজ্ঞান শিক্ষা’ ও ‘বিজ্ঞানমনস্ক চিন্তা’

লিখেছেন – জাহিদ রুদ্র



“বিজ্ঞানশিক্ষা ও বিজ্ঞানমনষ্কতার মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। উইকিপিডিয়া থেকে প্রাপ্ত তথ্য হতে জানা যায়, বিজ্ঞান হচ্ছে বিশ্বের যাবতীয় ভৌত বিষয়াবলী পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণ, যাচাই, নিয়মসিদ্ধ, বিধিবদ্ধ ও গবেষণালদ্ধ পদ্ধতি যা জ্ঞানকে তৈরিপূর্বক সুসংগঠিত করার কেন্দ্রস্থল। ল্যাটিন শব্দ সায়েনটিয়া থেকে ইংরেজি সায়েন্স শব্দটি এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে জ্ঞান। বাংলা ভাষায়

বিজ্ঞান শব্দটির অর্থ বিশেষ জ্ঞান।" আবার, আধুনিক বিজ্ঞানের উৎস আলোচনা করতে গিয়ে বলা যায়, দর্শন হতেই বিজ্ঞানের উন্মেষ। যদিও আমরা বর্তমানে দেখতে পাই দর্শন ও বিজ্ঞান দুটি পৃথক পদ্ধতিগত শিক্ষা। তথাপি দার্শনিক পদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অভিন্ন নয়। হয়ত নীতিগতভাবে এদের মধ্যে কোনো বৈসাদৃশ্য থাকার কথা ছিল না। 'কারণ প্রাচীনকালে সভ্যতার ঊষালগ্নে আমরা বিজ্ঞানকে দার্শনিক বিষয়বস্তু হিসেবেই আলোচিত হতে দেখি। তখন বলা হতো, Natural Philosophy বা ভৌত দর্শন। নিউটনের ‘ন্যাচারালিস ফিলোসফিয়া প্রিন্সিপিয়া ম্যাথমেটিকা’ এর প্রমাণ। পদার্থবিজ্ঞানে যুক্তির প্রয়োগ, আরোহী-অবরোহী পদ্ধতির প্রয়োগ – এসবই দার্শনিক ভাবপ্রসূত। কিন্তু ক্রমশ গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান শাস্ত্রীয় দর্শন থেকে আলাদা হয়ে বর্তমান বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।'

'সুতরাং, বিজ্ঞান শব্দটির সবচেয়ে সরলীকৃত অর্থ হলো- বিজ্ঞান হচ্ছে একটি দর্শন, যে দর্শনের মূল ভিত্তিই হলো প্রশ্ন করা ও কার্যকরণ অনুসন্ধান করা।' এবং, এককথায় বিজ্ঞানমনস্কতা বলতে সেই দুটি বৈশিষ্ট্যকে বুঝায় যা বিজ্ঞানকে ধারণ করতে অপরিহার্য। এই দুটি বৈশিষ্ট্য হলো – প্রশ্ন করার প্রবণতা এবং কার্যকরণ অনুসন্ধানের প্রবণতা। সুতরাং, যে ব্যক্তি অন্তরে উপরোক্ত দুটি বৈশিষ্ট্য

ধারণ করবেন তিনিই বিজ্ঞানমনষ্ক হিসেবে বিবেচিত হবেন। এজন্য বিজ্ঞানের ছাত্র হবার প্রয়োজন নাই। যেমন: পেরিয়ার, আহমদ শরীফ বা হুমায়ুন আজাদ, কেউই বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। দর্শন ও সাহিত্যের ছাত্র হয়েও তাঁরা বিজ্ঞানমনস্কতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তেমনি স্বশিক্ষিত বিজ্ঞানমনষ্ক ছিলেন আরজ আলী মাতুব্বর। তিনিও স্বেচ্ছায় প্রশ্ন ও কার্যকরণ অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিজ্ঞানমনষ্কতার প্রমাণ রেখেছেন। একই কথা প্রযোজ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বেলায়ও। তিনিও বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। তিনি ছিলেন একজন সমাজ সংস্কারক। কিন্তু, তিনি গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন শিশুদের। শিখিয়েছেন আহ্নিক গতি বার্ষিক গতির কার্যকরণ।

অপরদিকে, “বিজ্ঞানশিক্ষা” শব্দটি শুধুমাত্র পদ্ধতিগত এবং সীমাবদ্ধ বিজ্ঞান শিক্ষাকেই বুঝায়। এটি সাবজেক্ট ও সিলেবাসনির্ভর নিতান্তই সীমিত পরিসরে বিজ্ঞানের কিছু কার্যকরণকে আয়ত্ব করার শিক্ষা। রাষ্ট্রপ্রণীত “শিক্ষা” সর্বদাই নির্দিষ্ট। এর গতিপথ নির্দিষ্ট এবং নিয়ন্ত্রিত। যেকেউ এই নির্দিষ্ট গতিপথে চলে, নির্দিষ্ট সিলেবাস মুখস্থ করে “বিজ্ঞানশিক্ষা” সম্পন্ন করে দক্ষ কর্মী হতে পারে। এই সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শী একেকজন কর্মী উৎপাদন নিশ্চিত করে। এতে সেই কর্মীটি

অন্তরে আদৌ প্রশ্ন করার এবং অনুসন্ধানের ক্ষমতা রাখেন কিনা – সে ব্যাপারে কোনো নিশ্চয়তা থাকে না। বস্তুত, এই বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশকে শিক্ষাব্যবস্থা তেমন গুরুত্ব দেয় না। একজন ব্যক্তির মনের মধ্যে প্রশ্ন করার ক্ষমতা এবং অনুসন্ধানের স্পৃহা জাগবে কি জাগবে না তা নির্ভর করে তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, পারিবারিক শিক্ষা এবং শিক্ষাব্যবস্থার পরিবেশের উপরে।

এবারে আরও একটি ঘটনার কথা বলি যা আমাদের পরিষ্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করবে, পদ্ধতিগত "বিজ্ঞানশিক্ষা" কিভাবে একজন ব্যক্তিকে বিজ্ঞানমনস্ক করতে ব্যর্থ হয়। ক্লাস টেনের যখন আমি ছাত্র ছিলাম। তো, আমাকে বাসায় সাইন্স ও ম্যাথস পড়াতেন পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স-মাস্টার্স ডিগ্রিধারী একজন স্কুল শিক্ষক। তিনি আমাকে খনিজ পদার্থের সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বুঝাতে গিয়ে বলেছিলেন, হাজার বছর ধরে গাছপালা মাটির তলায় পড়ে বিভিন্ন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এইসব খনিজ মজুত হয়েছে – এসব শুধু পড়ার জন্য পড়ো, কিন্তু বিশ্বাস করো না। কারণ, ধর্মগ্রন্থে স্পষ্ট আছে, এইসব স্রষ্টার দান।

অর্থ্যাৎ, তিনি নিজে বিজ্ঞানচর্চা করেছেন ঠিকই, কিন্তু, বিজ্ঞানমনস্ক হতে পারেন নাই। এবারে তিনি আমাকে বিজ্ঞানচর্চা করতে বলছেন ঠিকই কিন্তু বিজ্ঞানমনস্ক হতে

রীতিমত বাধা দিচ্ছেন! এইভাবে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থীরা বাধাগ্রস্থ হয় পদে পদে। (যদিও আমি পরবর্তীতে আর্টস নিয়ে পড়াশোনা করি) 'বিজ্ঞানমনস্কতা ও বিজ্ঞানশিক্ষার মধ্যকার এই যে দ্বৈরথ তা মানুষকে বিজ্ঞানমনস্ক হতে বাধা দেয়। বিজ্ঞানশিক্ষা হলো প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার একটি অংশবিশেষ। তাই, বিজ্ঞানমনস্কতা এবং বিজ্ঞানশিক্ষা পুরোপুরি দুইধরণের কথা বলে। বিজ্ঞানমনস্কতা মানুষকে বলে সম্ভাবনার কথা। আর বিজ্ঞানশিক্ষা বলে সীমাবদ্ধতা ও শর্টকাটের কথা। অর্থাৎ, কোন পথে, কতটুকু বিজ্ঞান শিখলে দক্ষ টেকনোলজিস্ট হওয়া যাবে এবং কোন কোন পথে যাওয়া বারণ।

“শিক্ষা” সামগ্রিকভাবে একটি প্যাকেজ, যেখানে জ্ঞানের বহু শাখার অল্প অল্প তথ্য সীমাবদ্ধ করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ হলো রাষ্ট্রপ্রণীত একটি কৃত্রিম ব্যবস্থা যেখানে শিক্ষার্থী মূলত রাষ্ট্রের কাছ থেকে শিখছে, প্রকৃতির কাছ থেকে নয়। বিজ্ঞানশিক্ষাও এইরকম একটা প্যাকেজ। এখানেও রয়েছে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রণীত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে স্রেফ দক্ষতা অর্জনের জন্য বিশেষ সিলেবাস এবং লিমিটেড পাঠদান। অপরপক্ষে, বিজ্ঞানমনস্কতা রাষ্ট্রনির্ভর কোনো বিষয় নয়, প্রকৃতিনির্ভর বিষয়। এর কোনো সীমা-পরিসীমা নাই, এতে রয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা এবং নিজস্ব সিদ্ধান্ত যাচাই করার সুযোগ।

অপরদিকে শিক্ষাব্যবস্থা তথা বিজ্ঞানশিক্ষার কেবলমাত্র দুটি উদ্দেশ্য – পরীক্ষার নম্বর ও অর্থসংস্থান। এই অর্থসংস্থান হলো বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে করে খাওয়ার নিছক শিক্ষা, কোনো দর্শনের উন্মেষ ঘটানো এর উদ্দেশ্য নয়। কারণ, বৈজ্ঞানিক দর্শনের উন্মেষ বস্তুত সকল বিষয়কেই প্রশ্নবিদ্ধ করে, এমনকি তা শাসককেও প্রশ্নবিদ্ধ করতে ছাড়ে না। আর শাসক প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া মানে শিক্ষাব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া। মুক্তচিন্তার উন্মেষ মানেই সকল পদ্ধতিগত, সীমিত জ্ঞানচর্চার বিলোপ। সুতরাং, বিজ্ঞানমনস্কতার বিকাশ বিজ্ঞানশিক্ষা, শিক্ষাব্যবস্থা এমনকি খোদ রাষ্ট্রের জন্যেও একটি বিপদজনক বিষয়ই হয়ে দাঁড়ায়।'

কিন্তু, বিজ্ঞানশিক্ষা কেবলমাত্র বিজ্ঞানের নির্দিষ্ট কিছু তত্ত্ব শেখায়। সেগুলো মানুষকে প্রশ্ন করতে উদ্বুদ্ধ করে না, ফলে শাসক থাকেন নিরাপদ। শিক্ষাব্যবস্থা এবং বিজ্ঞানশিক্ষা বলতে আমি শুধু দেশের পরিপ্রেক্ষিতকে বুঝাচ্ছি না। "শিক্ষাব্যবস্থা" বা "বিজ্ঞানশিক্ষা" – এসবের প্রকৃতি সমগ্র পৃথিবীতেই কমবেশী একইরকম। খোদ ইংল্যান্ডের শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে জর্জ বার্নাড শ বলেছিলেন, "একজন ছাত্রকে গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রী দেওয়া হয় কখন? যখন সেই ছাত্র একটা তথাকথিত শিক্ষাপ্রদানের পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যেতে যেতে শেষ পর্যন্ত

সে নিজের সম্বন্ধে ভাববার সকল ক্ষমতা হারিয়ে ফেল তখন।”

শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক শিক্ষাকেও সীমাবদ্ধ করে বিজ্ঞানমনষ্কতাকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টাও স্পষ্ট। দেশের ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায় দীর্ঘদিন বিশেষ কোনো ব্যবহারিক বিজ্ঞানশিক্ষার ব্যবস্থাই ছিলোনা। "এজন্য খোদ বিজ্ঞানশিক্ষাও বেশ প্রকাশ্যেই সমাজে চলে আসা হাজার বছরের ধর্মশ্রায়ী কুসংস্কারগুলোকে ধারণ করে, এদের রদ করার চেষ্টা করে না। স্রেফ টেকনোলজিতে দক্ষ কর্মী উৎপাদনের জন্য কুসংস্কারকে দূরীকরণের প্রয়োজনও নাই। তাই, খোদ বিজ্ঞানের শিক্ষকেরাই বিজ্ঞানমনষ্ক নয়। তাঁরাই বয়ে বেড়ান ধর্মাশ্রয়ী কুসংস্কার। তাঁরা শিক্ষার্থীদের মনে সেইসব কুসংস্কারের বীজ বপন করে দেন। পরিবার থেকেও শিক্ষার্থীরা পায় নানান ধরণের ধর্মাশ্রয়ী কুসংস্কারের শিক্ষা। ফলে, উচ্চতর শিক্ষায় দেশসেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পড়ার সুযোগ পেলেও ছোটবেলা থেকে মনের মধ্যে জেঁকে বসা কুসংস্কারগুলো বিজ্ঞানকে মনের মধ্যে আলোড়িত করতে বাধা দেয়।"

আবার, আরেকটু ভিন্নচিত্রও দেখা দেয়। যদি আমরা ধরে নেই এইসব শিক্ষার্থীর জীবনে ধর্ম একটা বিরাট প্রভাব ফেলে, তারা ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে মেনে চলে –

তাহলেও ভুল হবে। এটা শুধু ধর্মপ্রেম নয়। এ হলো নিখাঁদ কুসংস্কার, নিখাঁদ গোড়ামী। ব্যক্তিগত জীবনে এদের বেশীরভাগও ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি নির্ভরশীল নয়, শুধুমাত্র বিজ্ঞানশিক্ষার বেলায় ঘটে সংঘাত, তাও কিছু কিছু নির্দিষ্ট প্রশ্নে – যেমনঃ কসমোলজি বা সৃষ্টিতত্ত্ব, বিবর্তনতত্ত্ব, ভূগোল ইত্যাদি।

"এতো গেল ধর্মাশ্রয়ী কুসংস্কারগ্রস্থদের কথা। আবার, এমনও বিজ্ঞানশিক্ষার্থী দেখা যায় যারা হয়তো বিজ্ঞানচর্চায় পারদর্শী কিন্তু নিজেরা বিজ্ঞানমনস্ক নয়। অর্থ্যাৎ, উদ্ভাবনীর দিকে এদের আগ্রহ নেই বললেই চলে। এরা দক্ষ বিজ্ঞানকর্মী হতে পারে, কিন্তু কোনোভাবেই বিজ্ঞানী নয়। এরকম উদাহরণ ভরি ভরি যেখানে শিক্ষার্থীর একাডেমিক রেজাল্ট দুর্দান্ত, কিন্তু, তারা মোটেও বিজ্ঞানমনস্ক নয়। তারা বিজ্ঞানকে আয়ত্ত্ব করতে পারে, তত্ত্বের মারপ্যাঁচ, জটিল-কঠিন সমীকরণ বুঝতে পারে, তা দিয়ে বিভিন্ন প্রজেক্টও করতে পারে কিন্তু, সৃজনশীলতার বেলায় অত্যন্ত কাঁচা। অর্থ্যাৎ, জানাশোনা সমীকরণ, জানাশোনা সমস্যা এরা সমাধান করতে পারে, কিন্তু উদ্ভাবনী শক্তি গড়পড়তা নেই বললেই চলে। বিজ্ঞানশিক্ষার পরেই এদের লক্ষ্য থাকে কোনো কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করা অথবা বিদেশে পাড়ি জমানো। আমাদের দেশের সর্বোপরি বিজ্ঞানশিক্ষার যে চল, যে কাঠামো রয়েছে সেটাই এই সৃষ্টিশীলতাকে নষ্ট

করার জন্য দায়ী বলে মনে হয়। তাছাড়া, আমাদের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, ওয়ার্কিং সেক্টরের অভাব এসবও গভীরভাবে জড়িত। এসব ছাড়াও আরও একটি ব্যাপারকে আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয় তা হলো, আমাদের সমাজে বিজ্ঞানশিক্ষা একটি এলিট স্থান অধিকার করেছে। এখানে ছেলেমেয়েদের চাপ দিয়ে বিজ্ঞান পড়তে দেওয়া হয়। অনেকের হয়তো থাকে না যথেষ্ট আগ্রহ। তাছাড়া সেই পুরাতন কুসংস্কারগুলোকেও আরও সযত্নে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। অর্থনৈতিক অবস্থা তাকে বাধ্য করে এই ভাবতে যে – কোনোমতে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা শেষ করতে পারলেই হলো, তাহলেই মিলে যাবে একটা চাকুরী। এইরকম মানসিকতা থেকে বিজ্ঞানকে শুধু চর্চা করাই হয়, নিজেকে শুধু কর্পোরেট জগতের জন্য প্রস্তুত করাই হয় কিন্তু, প্রকৃত বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে মস্তিষ্কে যে যুক্তিবোধ ও বিজ্ঞানমনস্কতার অনুরণন ঘটার কথা, তা আর ঘটার সুযোগ পায় না। কুসংস্কার, অপশিক্ষা আর রাষ্ট্রীয় দৈন্যের ফলে অঙ্কুরেই নষ্ট হয়ে যায় এইদেশের বেশীরভাগ শিক্ষার্থীর

বিজ্ঞানমনস্কতা; বিজ্ঞান আটকে যায় সীমিত পরিসরের মধ্যে। বিজ্ঞানচর্চা ও বিজ্ঞানমনস্কতা এক জিনিস নয়। বিজ্ঞানমনস্ক একজন ব্যক্তি সর্বদাই স্বশিক্ষিত এবং শুভব্রতচারী। তাঁরা যদিও জনহিতকর কাজে নিয়োজিত থাকেন। বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের মধ্যে স্বাধীনতাবোধ জাগ্রত

হতে বাধ্য। আর, স্বাধীনতাবোধ কর্তৃত্বতন্ত্রের পতন ঘটানোর জন্য সবচেয়ে শক্তিশালী চেতনা। এতে রাষ্ট্র নামক কর্তৃপক্ষের অস্তিত্ব ধ্বংসের মুখোমুখি হয়। একজন বিজ্ঞানমনষ্ক মানুষ সমাজের সংস্কার সাধন করেন ঠিকই তথাপি খোদ রাষ্ট্রই তাঁর শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। আবার, উল্টোদিকে রাষ্ট্র বিজ্ঞানশিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে টেকনোলজির প্রতি অন্ধমোহ সৃষ্টি করে। আর, টেকনোলজির প্রতি অন্ধমোহ পারমাণবিক বোমার জন্যও ভালোবাসার জন্ম দিতে পারে। বিজ্ঞানকে তাই ক্ষুদ্র পরিসরে আটক করে ফেললে তা জন্ম দেবে স্রেফ চমকপ্রদ কর্পোরেট খেলনার। এসব খেলনা দিয়ে মানুষ খেলবে ঠিকই, পয়সাও আসবে বহুত, কিন্তু, সংস্কার ভাঙবে না।

স্কিন ক্যান্সার, সানস্ক্রিন ক্রিম প্রডাক্ট ও সান প্রটেকশন ফ্যাক্টর (SPF), একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

লিখেছেন – প্রিন্স ফার্দিনান্দ

(Cosmetic Research Chemist)



বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১ মিলিয়ন সংখ্যক মানুষ স্কিন ক্যান্সার এ আক্রান্ত হয় এবং Malignant melanoma নামক স্কিন ক্যান্সার এ আক্রান্ত হয়ে প্রায় ১০ জন এর মতো মারা যায়। বেশিরভাগ স্কিন ক্যান্সারই হয় সাধারণত

শরীরের যেসব অংশ (মুখমণ্ডল, ঘাড়, মাথা, হাতের পিছনের অংশ) সূর্যের আলোতে উন্মুক্ত থাকে। [১]

বেশিরভাগ স্কিন ড্যামেজের জন্য প্রধান ফ্যাক্টর হিসেবে সৌর বর্ণালিতে বিদ্যমান অতিবেগুনী রশ্মিকে দায়ী করা হয়। [২]

তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর ভিত্তি করে অতিবেগুনী রশ্মি ৩ শ্রেনীর হয়ে থাকে। যথা-

১) UVA (320 to 400 nm)

2) UVB (290 to 320 nm)

3) UVC (100 to 290 nm)

এই তিন অতিবেগুনী রশ্মির মধ্যে Ultra violate C বা UVC বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর দ্বারা শোষিত হয়, ফলে তা পৃথিবীতে আসতে পারে না। কিন্তু Ultraviolate B বা UVB এবং Ultraviolet A বা UVA সহজেই ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারে। কাজেই, UVA এবং UVB উভয়টি দ্বারাই স্কিন আক্রান্ত হতে পারে যার ফলশ্রুতিতে, sunburn, Solar keratosis, photoageing, Skin Cancer, DNA & RNA Damage এর মতো চরম ক্ষয়ক্ষতির স্বীকার হতে হয়। [৩]

অতিবেগুনী রশ্মি দ্বারা সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির (যেমন, Cataract) কারণে প্রতিবছর প্রায় ৩ মিলিয়ন মানুষ তাদের দৃষ্টিশক্তি হারায়। [৪]

কাজেই, ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাব থেকে স্কিন ও চোখকে সুরক্ষিত রাখতে একটি কার্যকর ও উচ্চ Sun Protection Factor (SPF) মান সম্বলিত সানস্ক্রিন প্রডাক্টের ব্যবহার খুবই দরকারি। তারই দ্বারাবাহিকতায় দেখা যায়, Skin Brightening প্রডাক্ট (যেমন, Sunscreen Cream বা Day Cream, Sunscreen Lotion, Sunscreen Moischarizer, Foundation ইত্যাদি) বর্তমানে বিশেষ করে এশিয়ার মার্কেটগুলোতে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে।[5]

আমার এই স্টাডির মূল লক্ষ হলো, স্কিন ড্যামেজ ও স্কিন ক্যান্সার প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা, মার্কেটে বিদ্যমান বিভিন্ন ব্রান্ডের প্রডাক্ট থেকে ভোক্তারা কিভাবে একটা ভালো, কার্যকর ও উৎকৃষ্টমানের Sunscreen প্রডাক্ট খুঁজে নিতে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও দিকনির্দেশনা দেয়া এবং এসব প্রডাক্টের সাইড ইফেক্ট সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করা।

Sun Protection Factor (SPF):

একটা সানস্ক্রিন প্রডাক্টের কার্যক্ষমতা বা ফলপ্রসূতা সাধারণত পরিমাপ করা হয় তার SPF মান দিয়ে যা In Vivo অথবা In vitro উভয় পদ্ধতিতেই মূল্যায়ন করা যায়। যে প্রডাক্ট এর SPF মান যতো বেশি তার কার্যক্ষমতা তত বেশি। SPF কে সাধারণত সংজ্ঞায়িত করা হয় নিম্নোক্তভাবে -

সুরক্ষিত ত্বকে (protected Skin with sunscreen) এরিথেমা উৎপন্ন করতে অতিবেগুনি রশ্মির যে সময় লাগে তার এবং অরক্ষিত ত্বকে (Unprotected skin without sunscreen) এরিথেমা উৎপন্ন করতে অতিবেগুনী রশ্মির যে সময় লাগে তার অনুপাতকে সান প্রটেকশন ফ্যাক্টর (SPF) বলে।

অর্থাৎ

SPF = সুরক্ষিত ত্বকে উৎপন্ন নূন্যতম এরিথেমাল ডোজ/অরক্ষিত ত্বকে উৎপন্ন নূন্যতম এরিথেমাল ডোজ

নূন্যতম এরিথেমাল ডোজ (Minimal Erythemal Dose) কে আবার নিম্নোক্তভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় -

"অরক্ষিত ত্বকে একটি ন্যূনতম, অনুধাবনযোগ্য এরিথেমা তৈরি করতে পর্যাপ্ত UV আলোক বিকিরণের সর্বনিম্ন

সময়ের ব্যবধান বা ডোজকে Minimal Erythemal Dose বা MED বলে।" [৬]

'এরিথেমা' হল ত্বকে সৃষ্ট একধরনের প্রতিক্রিয়া যা সংক্রমণ বা কিছু ওষুধের (যেমন, কসমেটিক ক্রিম) কারণে হতে পারে।

SPF মান নির্ণয় পদ্ধতি:

SPF Value সাধারণত In vivo ও In vitro উভয় পদ্ধতিতেই নির্ণয় করা যায়। 'In vivo' একটি ল্যাটিন শব্দ যা দ্বারা বোঝায় "Within the living"। মানে যখন কোন রিসার্চ বা কাজ জীবন্ত প্রানীদের উপর বা জীবন্ত প্রাণীদেহের উপর সম্পন্ন করা হয় তখন তাকে বলে In vivo পদ্ধতি।

অন্যদিকে, ল্যাটিন শব্দ 'In vitro' দ্বারা বোঝায় "Within the glass"। অর্থাৎ যখন কোন রিসার্চ বা কাজ জীবন্ত প্রাণীদেহের বাহিরে (যেমন, ল্যাবরেটরিতে) কাচের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে করা হয়ে থাকে তাকে In vitro পদ্ধতি বলে। [৭]

In vivo পদ্ধতি একটি দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ পদ্ধতি এবং আরও বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা থাকায় বর্তমানে SPF নির্ণয়ে In vitro technique খুবই জনপ্রিয়। কারণ এক্ষেত্রে খুব

অল্প সময়ের মধ্যেই UV-Vis spectrophotometric পদ্ধতিতে Mansur Equation ব্যবহার করে কোন নমুনার SPF মান নির্ণয় করা যায়।

কসমেটিক পণ্যের গ্রহনযোগ্য SPF মান:

আমেরিকার Food and drug administration (FDA) এর নতুন Requirements অনুযায়ী, সাধারণত কোনও সানস্ক্রিন পণ্যের SPF মান সর্বোচ্চ ৬০+ হওয়া উচিত তবে SPF 80+ হলেও সেটা মার্কেটিং এর জন্য অনুমোদনযোগ্য।[৮]

তবে সাধারণত SPF মান খুব বেশি বা খুব কম হওয়া উচিত নয়। কারণ, SPF মান খুব কম হলে তা ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাব থেকে ত্বককে বাঁচাতে পারবে না আবার খুব বেশি হলে তার ব্যবহারে শরীরে প্রয়োজনীয় ভিটামিন-ডি সিনথেসিস প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হবে। SPF মান ১৫ বা তার বেশি এরকম সানস্ক্রিনের সঠিক ব্যবহার প্রায় ৯৮% ভিটামিন-ডি উৎপাদন ক্ষমতা কমিয়ে দেয়।[৯]

সানস্ক্রিন এজেন্টস বা UV -Filters:

কসমেটিক প্রোডাক্ট ফর্মুলেশনে যেসব মেটেরিয়ালস বা কেমিক্যাল সানস্ক্রিন হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে সানস্ক্রিন এজেন্ট বা UV - Filter বলে।

UV ফিল্টার বা Sunscreen Agents:

UV Filter গুলো প্রধানত দুই ধরনের। যথা-

১) Topical Agents

2) Systemic Agents

Topical Argent গুলো প্রধানত দুই ধরনের। Organic ও Inorganic। Organic Agent গুলোর মধ্যে কিছু আছে যারা শুধুমাত্র UVA ফিল্টার করতে পারে এবং কিছু আছে যারা শুধুমাত্র UVB ফিল্টার করতে পারে। আবার কিছু কেমিক্যাল আছে যারা UVA ও UVB উভয়টিই ফিল্টার করতে পারে। [10]

নীচে Organic UV ফিল্টারগুলোর মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি কার্যকর কেমিক্যালগুলোর একটি তালিকা দেখানো হল:

UVA ফিল্টারস:

1.Benzophenones

2.Oxybenzone

3.Avobenzone or parsol

4.Mexoryl SX

UVB ফিল্টারস:

1.p-aminobenzoic aacid

2.Padimate O

3.Padimate A

4.Octyl Salycilate

5.Octyl Methoxycinnamate

6.Trolamine Salycilate

7.Homosalate

8.Octocrylene

9.Ensulizole

Broad Band Organic UV ফিল্টারস:

1.Mexoryl XL

2.Tinosorb M

3.Tinisirb S

Inorganic UV ফিল্টারস:

1.Titanium Dioxide (TiO_2)

2.Zinc Oxide (ZnO)

Dual UVA/UVB ফিল্টারস:

1.Mexoryl SX

2.Mexoryl XL

সিস্টেমিক UV filters:

1.Beta-Carotene

2.Carotenoids (Lycopene)

3.Selenium

4.Ascorbic Acid

5.Green tea polyphenols

6.Aspirin

সাইড এফেক্ট:

সানস্ক্রিন প্রডাক্টের ব্যবহার এ যেমন উপকার আছে তেমনি এর ব্যবহার নিয়ে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক, উদ্বেগ ও চ্যালেঞ্জ রয়েছে। [11]

নীচে এগুলোর কয়েকটি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

1. এক স্টাডিতে দেখা গেছে যে, ৭ মাস ধরে SPF 15 বা তার অধিক SPF ক্ষমতাসম্পন্ন সানস্ক্রিন প্রোডাক্ট ব্যবহার করে এরকম প্রায় ২০% মানুষের স্কিনে জ্বালাপোড়া লক্ষনীয়। [12]

২.ফটো এলার্জিক কারণে সৃষ্ট চর্মরোগের জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে দায়ী এজেন্ট হিসেবে Benzophenone, PABA, Eusolex 8020, [13] এবং Octyl Triazone [14] কে বিশেষভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩) একটি রিভিউ স্টাডিতে ৬ ধরনের রাসায়নিক প্রজাতির কার্যক্ষমতা ও মানুষের স্কিনে তাদের নিরাপদ কিনা তা বিশ্লেষণপূর্বক একটি রিসার্চ পেপার প্রকাশিত হয়েছে।[15] সেখানে প্রধান যে বিষয়গুলো পাওয়া গেছে তা নীচে উল্লেখ করা হলো -

১)Aminobenzoates: এরা ফটোএলার্জি ও ফটোবিষক্রিয়ার মতো কারণের জন্য দায়ী হতে পারে।

2)Benzophenones: স্কিনে ব্যবহার করার পর এরা শোষিত হয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে রক্ত ও মুত্রের সাথে মিশে যেতে পারে। Benzophenone-3 খুব দ্রুতই বিপাক হয়ে যেতে পারে এবং এর বিষক্রিয়া ও উল্লেখযোগ্য। যদিও Benzophenones এর মার্কেট এক্সপেরিয়েন্স সবমিলিয়ে পজিটিভ তথাপি এটি অন্যান্য UV ফিল্টার এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্কিন রিঅ্যাকশন এর জন্য দায়ী।

৩) Cinnamate গ্রুপের মধ্যে Octyl Methoxy Cinnamate (OMC) হলো হিউম্যান স্কিনের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ UV ফিল্টার।

৪) প্রতিষ্ঠিত মার্কেট অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে দেখা গেছে যে, Salycilate গ্রুপের মধ্যে Octyl Salycilate ও Homosalate হলো দুর্বল UVB ফিল্টার এবং এদের টক্সিসিটিও সন্তোষজনক।

৫) In vitro প্রদর্শন অনুযায়ী ধাতব অক্সাইডের মধ্যে টিটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড (TiO2) কে Photogenotoxicity র জন্য দায়ী করা হলেও এটা এখন অবধি একটা বিতর্কের বিষয় কারণ, In vivo পদ্ধতিতে তার বিপরীত প্রভাব পর্যবেক্ষন করা গেছে।

৬) প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী Ensulizole ও Octocrylene হিউম্যান স্কিনের জন্য নিরাপদ।

ভিটামিন-ডি সিনথেসিস:

ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি DNA ড্যামেজের জন্য দায়ী যা স্কিন ক্যান্সার এ রুপ নিতে পারে, কিন্তু এই অতিবেগুনী বর্ণালির একই অংশ আবার ভিটামিন-ডি ফটোসিন্থেসিস এর জন্য দরকারী। প্রায় ৯০% সংশ্লেষিত ভিটামিন-ডি সরাসরি সূর্যালোক থেকে উৎপন্ন হয়। [16]

কাজেই সূর্যালোক Avoid ও Exposure এর মধ্যে একটা যথাযথ ব্যালেন্স বজায় রাখা দরকার।

Endocrinologist, ডার্মাটোলজিস্ট ও পুষ্টিবিদদের প্রস্তাবনা অনুযায়ী, সপ্তাহে প্রায় ২ থেকে ৩ বার ৫-১০ মিনিটের মতো শরীরে (বিশেষ করে, মুখমণ্ডল, ঘাড়, মাথা ও হাতের পেছনের অংশ) সূর্যালোক মাখানো উচিত। [17]

রেফারেন্স:

[1]. Dutra E.A, Oliveira D.A.G.C., E.R.M.Kedor-Hackman,Santoro M.I.R.M. Determination of sun protection factor (SPF) of sunscreens by ultraviolet spectrophotometry. Bra.J.Pharm.Sci.40,31(2004)

[2] T.Amnuaikit, P. Boonme. Formulation and characterization of sunscreen creams with synergistic efficiency on SPF by combinatiin of UV filters. Journal of Applied pharmaceutical science, Vol.3pp.01-005, August, 2013.

[3] T.Amnuaikit, P. Boonme. Formulation and characterization of sunscreen creams with synergistic efficiency on SPF by combinatiin of UV filters. Journal of Applied pharmaceutical science,Vol.3pp. 01-005, August, 2013.

[8] Young RW.The family of sunlight-related eye diseases.Optom Vis Sci 1994;71:125-44.

[5] Boonme P, Ammuaikit T. Effect of cream formulas on SPF values of sunscreen creams containing bemotrizinol and titanium Dioxide as the actives. Isan J Pharm Sci 2013; 9(1):128

[6] Wood, C, ; MURPHY, E. Sunscreens efficacy. Glob. Cosmet. Ind.,Duluth,v.167,p.38-44, 2000.

[7] https: //www.healthline.health/in-vivo-vs-in-vitro

[8] https: //www.fda.gov/drugs/understanding-over-counter- medicines/questions-and-answers-fda-posts-deemed-final-order-and-proposed-order-over-counter-sunscreen

[9] Holick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers and cardiovascular disease. Am J Clin Nutr 2004; 80(6 suppl): 1678S-88S.

[10] S.Gonzalez et al. The Latest on skin photoptotection.Clinics in Dermatology (2008),26, 614-626.

[11] S.Gonzalez et al. The Latest on skin photoptotection.Clinics in Dermatology (2008),26, 614-626.

[12] Foley P, Nixon R, Marks R, et al. The frequency of reactions to sunscreens: results of a longitudinal population -based study on the regular use of sunscreen in Australia. Br J Dermatol 1993;128:512-8.

[13] Bryden AM, Mosely H, Ibbotson SH, et al.Photopatch testing of 1155 patients:results of the U.K. multicenter photopatch dtudy gtoup.Br J Dermatol 2006;155:737-47.

[14] Darvay A, White IR, Rycroft RJ, et al.Photoallergic contact dermatitis is uncommon. Br J Dermatol 2001;145:597-601.

[15] Nash JF. Human safety and efficacy of ultraviolet filters and sunscreen products. Dermatol Clin 2006;24:35-51.

[16] Holick MF. Vitamin-D: a Millennium perspective. J Cell Boichem 2003;88:296-307.

[17] Holick MF. Sunlight and vitamin D for bone health and prevention of autoimmune diseases, cancers and cardiovascular disease. Am J Clin

Nutr 2004; 80(6 suppl): 1678S-88S.

সূচিপত্র

দাদু কেন ধর্মত্যাগ করলো?

লিখেছেন – অশোক দাস চার্বাক



"Cogito ergo sum : I think, therefore I am" - Descartes

শুধু আহার্য্যগ্রহন বাথরুমগমন আর শয্যাবিনোদনের সময়টুকু বাদ দিয়ে অনবরত চলতো তাঁর মালাজপা। এমন কি ঘুমের মধ্যেও। স্বপ্নের ঘরে প্রায়ই হরিনাম উদ্গিরণ হতো দাদুর গলা দিয়ে ঘড়ঘড়িয়ে। সূর্য ডোবার সাথে সাথে 'হরি দিন তো গেলো সন্ধ্যা হলো পার করো আমারে' গেয়ে হরিনাম, ভোরে উঠে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে

হরিনাম, শুতে যাবার আগে হরিনাম, হাই তোলার পাপ করার পরে হরিনাম, হাঁচিকাশির পরে হরিনাম, আনন্দে হরিনাম, দুঃখে হরিনাম, গড়গড়ার হুঁকো টানতে টানতে হরিনাম - মানে সদাসর্বদা পুন্যকাম। পুন্যকাজে মন তাঁর অটল। মক্কেলদের ট্যাক্স ফাঁকি দেবার কৌশল বাৎলানোর ফাঁকে ফাঁকে, মেজদাদুর সাথে শেয়ারবাজারের পর্যালোচনা, রেডিওর খবর শোনা, পাশের বাড়ির জন্মশত্রু জ্ঞাতিভাইদের দাম্পত্য কলহে এরেই পাতা, টিভির উন্মাদনৃত্য উপভোগ - কোনো কিছুই তাঁর মালাজপায় বিঘ্ন ঘটাটার পারতোনা। দাদু আমার সব্যসাচী। সব সময় তাঁর ঠোঁট কাঁপছে - গুরুবাবা গুরুবাবা আধবোজা আধ্যাত্যিক চক্ষুদুটি ভক্তিতে গদ গদ, ভাবের ঘোরে ঢুলু ঢুলু - মালা জপার বিরাম নাই। দিদার বানানো লাল ন্যাকড়ার মধ্যে হাতের মালা লুকিয়ে নিত্য তাঁর গুটি গোনার গুনগুনানি, পুন্যগোনার বিড়বিড়ানি। কপালে তিলক,গলায় তুলসী। শয়নে স্বপনে - বিজনে মননে অনুক্ষন তাঁর একই ভাবনা - পাপক্ষালন, আর পুণ্য অর্জন। বাড়িময় ধূপধুনোর ধূম্রদূষণ, কাঁসরঘন্টার ঝনঝনানি, রামভজনের প্যানপ্যানানি, শ্যাম বিরহের গানকাঁদুনি মধুমাখা কৃষ্ণনাম শুনতে শুনতে কান বিষতেতো যেত মামাবাড়ি এসে।

গঙ্গাতীরে প্রাতঃভ্রমণের সময় কীর্তনীয়াদের সাথে হাঁটতে হাঁটতে নাচতে নাচতে কৃষ্ণনাম করতেন তিনি দুহাত তুলে। শরীর-স্বাস্থ্য, আনন্দ পুন্য বাড়তো তাঁর দেহ

মন আত্মায় এক সাথে। পরিচিতদের সাথে দেখা হলে 'নমস্কার' না বলে বলতেন 'জয় গোবিন্দ-জয় নিতাই'। আলাদা কোন পরিশ্রম না করে বাড়তি পুন্য ফোকটে। স্নানের পর ঠাকুরঘরে পাক্কা আধটি ঘন্টা। সে ঘরের ঠাকুর সিংহাসনে ক্লাসিক্যাল ব্রহ্মা,বিষ্ণু, মধ্যযুগীয় কালী মনসা, নবাগতা সন্তোষীমাতা জয়মাতাদি, অত্যাধুনিক চন্দ্রস্বামী, বালক-নাবালক, জেলমন্দিরবাসী খুনী রাম রহিম বাবা, পরমপূজ্য সপুত্র ধর্ষকবাবা শঙ্করাচার্য সবাই বসে থাকতো চোখবোজাদাদুর চোখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আশীর্বাদ দিতে দিতে। তাছাড়া দেওয়ালভর্তি দেওয়ালভর্তি অগুনতি ক্যালেন্ডার দেবতারাও পেরেকে দুলতেন পাখার হাওয়ায়। আবার রথের মেলা থেকে কেনা কাঠের যীশু পেরেকবিদ্ধ হয়ে ঝুলতেন সেখানে। মাটির এক বুদ্ধদেবও চোখ বন্ধ করে ধ্যান করতেন কুলুঙ্গিতে বসে। কোন ভগবান খাঁটি, কোনটি ভেজাল সেসব ধর্মীয় কুটকাচালিতে না গিয়ে সব রঙের সব দেবতাদের আশীর্বাদ সাপটিয়ে শুষে নিতেন আমার দাদু। তাঁর শুধু এক ভয় নরকগমন, আর এক সাধ স্বর্গারোহন।

সব তীর্থ তাঁর সপূর্ণ। হরিদ্বার, হৃষিকেশ, কামরূপ, কামাখ্যা, গয়া কাশী কিচ্ছু বাকি নেই। রামকৃষ্ণ মিশন-ভারত সেবাশ্রমে নিয়মিত চাঁদা, এককালীন টাকা জমা দিয়ে পুরীদেবের কাস্টমার সার্ভিসে নাম রেজিস্ট্রি করে রেখেছেন দাদু। তাছাড়া কুষ্ঠাক্রান্ত ভিখারী,

ফুটপাথকালী, বটতলাশিব, প্লাটফর্মশনি, ঝুপড়ীদরগা, বেদখলকারী শীতলা-মনসাদের দিকে পয়সা ছোঁড়া, পিতামাতাদের আত্মাধারী কাক কুকুর গুৰুজনাদিদের জন্য বাসি রুটিমুড়ি ছড়ানো কিচ্ছু বাকি রাখেন না তিনি। কালো পিঁপড়েসহ গৃহদেবতাদের পাতে নিয়মিত নকুলদানা প্রদানে হাড়কেপ্পন দাদু ছিলেন গৌরীসেন দরাজ।

আরো আছে। দাদুর পারিবারিক গুরুবাবা বছরে দু-দুবার দাদুর বাড়িতে দেহ ফেলতেন ক'দিনের জন্য। সাথে আসত একপাল মেদটেপা চেলা, কল্কিসাজানো চামুন্ডা, আর প্রচার টাউট উমেদার। সেদিন তাঁদের সেবার্থে অন্যান্য উপকরণসহ প্রচুর ঘি আর গাঁজা আনতে হতো। সেই ঘি বাবার মেদরক্ষা আর গাঁজার ধোঁয়ায় তাঁর মগজ-আত্মাটা থাকত আধ্যাত্বিক। আর এই সব দানধ্যান, ঘৃত-গঞ্জিকা, রামনাম কৃষ্ণনাম বৈদিক প্রক্রিয়ায় পুণ্যে রূপান্তরিত হয়ে দাদুর আত্মাকে করতো টইটুম্বুর।

এহেন পূর্ণধার্মিক দাদু সর্ব প্রকার ধর্ম অভিনয় ছেড়েছুঁড়ে ধর্মশৃঙ্খলমুক্ত সাধুপুরুষ হয়ে গেছেন। আশৈশব বয়ে বেড়ানো ধর্মের আবর্জনার গুরুভার কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলে হয়ে গেছেন সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী ভদ্রলোক - সাহসী মুক্তপুরুষ। চিত্ত হয়েছে তাঁর ভয়ভীতিশুন্য। দেবদেবীদের পাত্তাই দিচ্ছেন না আর। একেবারে ডোন্ট কেয়ার ভাব। দশ আঙুলের তের গ্রহরত্ন আঁটানো আংটি,

দুই বাহুতে চার চারটে তাবিজ,গলার রুদ্রাক্ষের মালা - সব নাকি তিনি নর্দমায় বিসর্জন দিয়েছেন প্রবল ঘৃনায়। তিনি এখন বাগান করছেন, ছবি আঁকছেন, উপন্যাস পড়ছেন, দিদার সাথে সিনেমা দেখতে যাচ্ছেন ! না, না, "বাবা তারকনাথ", "জয় সন্তোষীমাতা" নয়, - একেবারে সত্যজিৎ-তপন সিনহা, উত্তম-সুচিত্রা,শাহরুখ-কাটরিনা। এমন কি কদিন আগে নাকি দার্জিলিং আগ্রাও ঘুরে এসেছেন সদিদা।

তীর্থযাত্রা নয় - ট্যুর, ধর্মনিরপেক্ষ ভ্রমণ। তাজ্জব কি বাত।

দাদুর কথাবার্তা হাবভাবও অন্য রকম হয়ে গিয়েছে। বেচারা গুরুদেবের টাউটটা মাসিক তোলা চাইতে আসতে স্রেফ হাঁকিয়ে বলে দিলেন গুরুবাবাকে ভদ্রলোকদের মত খেটে খেতে। গুরুবাবারা নাকি সভ্য লোকেদের মত গতর খাটিয়ে মেদরক্ষা করবেন ! বেচারা দাদুর মাথাটা গেছে একেবারে। মাসকাবারী ঠিকে উড়িয়া দাঁতফোকলা পুরুতটা টিকিতে ফুল গেঁথে,তেলচিটে পড়া মোটা পৈতে দুলিয়ে সাত সকালে আসত ছুটতে ছুটতে। সোজা ঠাকুরঘরে ঢুকে ঠাকুরঘরের গৃহপালিত দেবদেবীদের মুখে ভাঙা দাঁতের ফাঁক দিয়ে বেরনো পানচেবানো লালথুথু ছেটাতে ছেটাতে কি সব দুর্বোধ্য এট্যাং দেহি ওটাং দেহি মন্ত্র বিড়বিড় করে বলেই ঝড়ের বেগে বলে যেত তেনাদের। সবশেষে দাদুর কপালে লাল হলুদের দুরঙা টিপটা লাগিয়ে দিয়েই পড়ি কি মরি করে

ছুট লাগাতো সে পাশের বাড়ির ষাটটার দোকানে ঝুলিয়ে রাখা গণেশকে মালা পরাতে। এখন এ বাড়ির হাতখোলা খদ্দেরটা হয়েছে তার হাতছাড়া। মাসে সাত টাকা আয় গেছে তার কমে। পলিথিন ব্যাগে বন্দি হয়ে গৃহদেবতাগণ ঠাঁই পেয়েছেন গুমঘরে - বাতিল করা ভাঙা আসবাবের সাথে। খালি ঠাকুরঘরে দুটো আলসেশিয়ান বাঁধা। দাদুর নতুন পোষ্য - তাঁর নতুন নেশা।

কী হতে পারে? বুড়ো বয়সে ভীমরতি, না কোনো দুষ্ট গ্রহের বৈদিক অভিশাপের প্রভাব? কোন কুসংসর্গের ফলও হতে পারে। যেভাবে যুক্তিবাদী ছেলে ছোকরারা মনোবিকারের চিকিৎসা করা শুরু করেছে! হয়তো দাদুর পবিত্র আধ্যাত্বিক পাগলামী সেরে গেছে। কিংবা এও হতে পারে - সারা জীবন খেটেখুটে জমানো পুণ্য ফিক্সট ডিপোজিট করে মূল পুণ্য বাড়াচ্ছেন সুদ খাটিয়ে। এখন তাঁর অবসরপ্রাপ্ত পেনশনারদের মত নিশ্চিন্ত অলস জীবন। বিনাশ্রমে পুণ্য বেড়ে চলেছে চক্রবৃদ্ধি হারে। সে পুণ্য ভোগ করবেন পরের জন্মে।

দিদাও তাই। বাংলা ক্যালেন্ডার পঞ্জিকায় যত ব্রত আছে (শুধু শিবরাত্রি ছাড়া - কেন না ঠাকুরের আশীর্বাদে তিনি যদি শিবঠাকুরের মত ড্রাগএডিক্ট হয়ে যান!) সব তিনি পালন করতেন পরম নিষ্ঠায়। গতবারও দেখেছি মামাবাড়ীতে পৌষমাসের পিঠেপুলি খেতে এসে। সকাল সন্ধ্যা পূজাপাঠ, শঙ্খ ফোঁকা, কপালে সিঁদুর

লেপা,ঘন্টা বাজিয়ে দেবদেবীদের ঝিমুনি ভাঙানো - কিচ্ছু বাদ দিতেন না দিদা। শরীর মন সদা পবিত্র রাখতে সারাদিন বারে বারে স্নান করছেন, হাত ধুচ্ছেন, মাজা বাসনগুলোও, বারে বারে মাজছেন, বারান্দায় ছেটাচ্ছেন গঙ্গাজল, উঠোনময় গোবরজল - হাতে তাঁর ধর্মজাত পবিত্র হাজা। তাঁর দেহ পবিত্রবাতিকতা দেখে অনেকে পুনর্জন্মবাদীরা অনুমান করতেন দিদা বুঝি আগের জন্মে মেথরানী ছিলেন। তাঁর ধর্মনেশা আর শুচিবাইয়ের ঠেলায় অতিষ্ঠ হয়ে আমার মামীরা স্বামীপুত্র সহ বেপাড়ায় ফ্লাট বাড়িতে পালিয়ে বেঁচেছেন। মায়ের মুখ থেকে শুনেছিলাম যে রান্নাঘরের উপস্থিত বাসন কোসন, ঘরের আসবাবপত্র কিংবা বাগানের গাছ বা বিড়ালটার কাছে অনুপস্থিত পুত্রপুত্রবধুদের অবিরাম নিন্দা কীর্তনের ফাঁকে পরম নিশ্চিন্তে তিনি দেবসেবা ও পরমগুরু পতিদেবতার চরণবন্দনা করতেন নিরুপদ্রব খালি বাড়িতে।

এহেন দিদা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ষোড়শীর মত উচ্ছল। হয়েছেন পতি পরম গুরুর অনুগামিনী জীবনমুখী সহধর্মিনী। নিজের হাতে অপবিত্র মুরগীর ঝোল রান্না করছেন নাতির জন্য। তাও আবার তাঁর শুচিশুদ্ধ রান্নাঘরে। হয়তো একদিন আমার বাড়ির মত গোমাংসও ঢুকবে সে রান্নাঘরে। ঐ রান্নাঘর শুচিশুদ্ধ রাখা নিয়ে মামীদের সাথে এই গত বছরেরও দেখেছি নিত্য ঝগড়া। এখন সব অন্য রকম। দিদার গলার হারে লোকনাথের

জায়গা দখল করেছে বাহারী লকেটে ! ফুল পাতা দেবতার সিংহাসন থেকে উৎখাত হয়ে আশ্রয় পেয়েছে টেবিলের ফুলদানিতে। পবিত্র ধর্মগ্রন্থের জায়গায় অপবিত্র নজরুল রবীন্দ্রনাথ সেন্টার টেবিলে। কপালের পুরুষতান্ত্রিক সিঁদুর, হাতের নোয়া শাঁখা, মাথার ঘোমটা সব হওয়া। দুনম্বরী লোকদেখানো বাজারচলতি নারীবাদী নয়,একেবারে যুক্তিবিজ্ঞান সম্মত আধুনিক। বুড়ী কলজের এলেম আছে দেখছি। তবে খুব উল্টোপাল্টা গোলমেলে ব্যাপার। পাঠকদের মনে হবে এ সব বানিয়ে বানিয়ে লিখেছি।

- দুই -

- হটাৎ তোমরা এমন পাল্টি খেলে কেন দাদু?

- ধর্মকর্ম সব ছেড়ে দিলাম দাদুভাই।

- সে তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তুদিন কেন?

- অনর্থক পুণ্য করতে গিয়ে একটি মাত্র মানবজীবন হেলায় হারাচ্ছিলাম। দিন গেল বৃথা কাজে হরিনাম ভজে .... মানে ঐ সব আর কি। বুড়ো বয়সে মনেও থাকে না শ্লোকগুলো। যাই হোক, better late than never, শেষ জীবনে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সব ছেড়ে মনোমধর্ম নিয়েছি। মানুষই আমার দেবতা। দেবপূজার ভড়ং না করে স্বামী বিবেকানন্দের পথ ধরে মানবসেবা, মানবপূজার ধর্ম নিয়েছি।

- তুমি যে মহাপাপী নাস্তিকদের মত কথা বলছ দেখি। মরার পর তুমি ভিখারী হয়ে জন্মাবে, নরকেও ঠাঁই হবে না তোমার। দেখে নিও।

- দেখে নেবার সুযোগ কোথায় রে হতভাগা? Dust thou art, মরার পরে and dust returneth.ধুলায় মিশে যাব আমি মরণের পরে। স্বর্গে বা নরকে গিয়ে অথবা পুনর্জন্ম লাভ করে কেউ কখনো পাপের শাস্তি পেয়েছে, না পুন্যকাজের পুরস্কার ভোগ করেছে বলে শুনেছিস, না দেখেছিস। সবইতো পুরুত সাধুসন্ত গুরুবাবা ধর্মজীবি পরজীবীদের রটানো গুজব।

-এসব অঙ্ক তোমায় কে শেখাচ্ছে দাদু?

- আমার নবগুরু বোস সাহেব। ওনার কাছেই দীক্ষা নিয়েছি আমি। সাহেবগুরু আমার চোখ খুলে দিয়েছেন রে ভাই। এতদিন আমি অন্ধ ছিলাম। পৃথিবীর সৌন্দর্য দেখিনি এতদিন। তোদের সুন্দরী দিদার রোমান্টিক মুখটাও এতদিন দেখিনি ভালো করে। ভুবনের আনন্দধারা উপভোগ করিনি। এখন যৌবনের দিনগুলো হারিয়ে খুব আফসোস হচ্ছে। খুব। যজাতির মত বা আশিতে আসা ভানু ব্যানার্জীর মত যুবক হয়ে আবার বিয়ে করতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তোর দিদা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না আমার বিয়ে দিতে। প্রেমই করতে দেয় না, তার বিয়ে।

- কে তোমার সাহেবগুরু দাদু?

- তিন -

- চা জলখাবার খেয়েছিসতো?

- একগাদা পিঠেপুলি পাটিসাফটা খেয়ে তোমার জন্য বসে আছি। দিদা বললো তুমি নাকি আজকাল হরিসভায় না গিয়ে মর্নিং ওয়াক করছো, বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারছ। কিন্তু তোমাকে যৌবনধর্মে দীক্ষিত করলো কে?

- তা হলে প্রথম থেকেই বলি। নতুন ট্যাক্স অফিসার জেলায় জয়েন করেছেন শুনে অন্য উকিল যাবার আগে তড়িঘড়ি সাহেবের বাংলোয় ছুটে গিয়েছিলাম। সাথে নিয়েছিলাম ঘোষ সুইটস থেকে কেনা একটা বিশাল সন্দেশের প্যাকেট, আর এক বোতল মোরব্বা আর তোদের দিদার ঠকুরবেদীর কিছু ফুল বেলপাতা। প্যাকেটগুলো ভক্তিভরে টেবিলে রেখে নমস্কার করে বললাম "আপনি এ জেলায় এসেছেন শুনে বাবা বক্রেশ্বরের প্রসাদ নিয়ে এলাম আপনার নাম পুজো দিয়ে। আর সিউড়ির বিখ্যাত মোরব্বা। খেয়ে দেখুন। "

- ওসব প্রসাদ আমার চলে না উকিলবাবু, আমি ঘোর নাস্তিক। অযথা আপনাদের ঠাকুরদেবতাদের চাটুকারিতা খোশামোদ করে সময় নষ্ট করি না। ওগুলো আপনি ফিরিয়ে নিয়ে যান। নাতিপুতিদের খাওয়ান ওগুলো।

বললাম," কি বলছেন স্যার, এসব বাক্য উচ্চারণ করা পাপ। এখানকার বাবা বক্রেশ্বরের আর তারাপীঠের তারা মায়ের মহিমা বোধ হয় আপনি জানেননা স্যার। কোনো

সাহেব এনাদের আশীর্বাদ না নিয়ে এ জেলার চেয়ারে বসেননি কখনো।

- বেচারাদের জন্য ভীষণ দুঃখ হয় আমার। এতো কষ্ট করে আপনারা ধর্মাচরণ করে পুন্য করছেন,, আর আর তার সুফল ভোগ করবেন আপনাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত অনাত্মীয় কোন একজন মানুষ যে এখনো জন্মায়নি এ পৃথিবীতে।

- বুঝলাম না স্যার,একটু খোলসা করে বলুন।

- আপনার পার্থিব শরীরে দেহ ও মন ছাড়াও একটা ২১ গ্রাম ওজনের প্রাকৃতিক অঙ্গ আছে বলে আপনি বিশ্বাস বা অনুমান করেন। আপনার দেহ ও স্নায়ুতন্ত্র চালিত মন নশ্বর। সেগুলো আপনার মৃত্যুর পরে ধংশপ্রাপ্ত হয়ে পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু শাস্ত্রকল্পিত সেই আত্মাটা অবিনশ্বর। দেখা যাচ্ছে আপনার অনুমিত আত্মাটার কোন মনও নেই, আবার স্মৃতিও নেই। তার প্রমাণ হচ্ছে আপনার শরীরের কোনও এক অনাবিষ্কৃত অংশে আপনার অনুমিত আগের জন্মের মৃত ব্যক্তির আত্মা সাঁটানো আছে সে অঙ্গটি আগের জন্মের সব কিছু ভুলে গেছে। আর এক বার বলি, আগের জন্মে যে মৃত ব্যক্তিটির দেহে যে আত্মাটি বাস করতো তার কথা আপনার মনে নেই।

- মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে আমার আপনার কথা শুনতে শুনতে।

- বিষয়টা যে খুবই জটিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আমার ভাষার দারিদ্রের কারণে আমিও হয়তো ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারছিনা। এবার আর একবার আমার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলি। আমার তথাকল্পিত আগের জন্মে যে অজানা মৃত ব্যক্তির দেহে আমার আত্মাটা বাস করতো, সে ব্যক্তির কথা আমার বা আমার আত্মাটার কিচ্ছু মনে নেই। আপনাদের বাপ দাদারা শিশু বয়সেই তাঁদেরও পূর্বপুরুষ থেকে বংশপরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধ্যান ধারনার ছাঁচ আমার আপনার সবার অপরিনত কাঁচা মনে ছেপে দিয়েছেন গায়ে কাদামাটিতে টেরাকোটা চাপানোর মত। ছাঁচে ছাপা সেই সনাতনী মৌলবাদী ধ্যানধারনা স্থায়ীভাবে গেড়ে বসেছে মননহীন,যুক্তিহীন, প্রশ্নহীন পরিবর্তনভীরু নিশ্চল অলস স্থবির মনে। আমার মত অল্প কিছু কৌতূহলী সাহসী মানুষ নরকের ভয় না পেয়ে মনন করতে করতে নিজের নিজের মনের সেইসব আবর্জনা ধুয়ে মুছে সাফ করতে পারে। যারা তা পারেনা তারা মনে করে মৃত্যুর পরে দেহ মন ধ্বংস হলেও আত্মা অমর অবিনশ্বর। তারা ভাবে সেই আত্মা ঈশ্বরের অর্থাৎ পরমাত্মার অংশ। কোন অজ্ঞাত কারণে ঈশ্বরের সেই অংশ অর্থাৎ আমার আত্মাটাকে পুন্যপুষ্ট করার গুরু দায়িত্ব আমার ওপর পড়েছে, এবং এও ধরে নিচ্ছি যে আমার শরীর ও মন তার কাজকর্মের দ্বারা ঐ আত্মাটাকে পাপে বা পুণ্যে পুষ্ট করে, এবং সেই পুষ্টি অনুযায়ী আমার মৃত্যুর পর আমার

আত্মাটা পরজন্মে ফলভোগ করবে অথবা অদৃশ্য কোনো একটা স্বর্গে বা নরকে যাবে। এইতো আপনাদের বিশ্বাস?

- এটা শুধু নিছক বিশ্বাস নয় স্যার, এটাই পরম সত্য। সব ধর্মের সার কথা। এই আধ্যাত্বিক লোভেইতো মানুষ ধর্মাচরণ করে।

- ঠিক আছে, এবার আমার দিকে মন দিন। আপনার মত গন্যমান্য মানুষেরা আমায় কত খাতির করছেন। অন্ততঃ খাতির করার ভান করছেন। আপনাদের শহরের সবচেয়ে ধনী পুরুষোত্তম আগরওয়ালাও এই খানিকক্ষন আগে একটা ঢাউস মিষ্টির প্যাকেট কোনো মিঠাইৰ দোকান থেকে কিনে বাবা বজরংবলীর প্রসাদ বলে ভেট দিতে এসেছিলেন। আমি কিসে তুষ্ট হবো এই চিন্তায় কুল পাচ্ছেন না আপনারা। আমি থাকি বিনি ভাড়ার বাংলোয়, জনগণের পয়সায় তেল পুড়িয়ে ম্যাসাঞ্জোর শান্তিনিকেতন ঘুরে বেড়াই। ক্ষমতা ও বিলাসের স্বর্গসুখ আমার হাতের মুঠোয়। অথচ আমার মত ধর্মীয় শাস্ত্রসম্মত পাপী ভূ-ভারতে আর কে আছে? আপনাদের বাবা বা গুরুবাবাদের এক ছিলিম গাঁজাতো দূরের কথা এক বান্ডিল বিড়ি দিইনি সারা জীবনে। শনি কালী লোকনাথ রামরহিমবাবাদের পাতে নকুলদানাও দিইনি। বখরি ঈদ খ্রিস্টমাসে মুসলমান ক্রিষ্টান আত্মীয়দের বাড়ীতে নিষিদ্ধ খাদ্য খেয়ে আসি। তবু আমি এত স্বর্গসুখ ভোগ করি কোন বিচারে?

- সে আপনার পূর্বজন্মের পুণ্যফল।

- ধরে নিলাম তাই। অর্থাৎ আপনি বলছেন যে আমার পূর্বজন্মে যে ভদ্রলোকটি হাড়মাস কালি করে জীবনভোর পৃথিবীসুখ থেকে নিজেকে বঞ্চিত রেখে যে পুন্য সঞ্চয় করেছিলেন সেই পুণ্যফল আমি ভোগ করছি। সে বেচারা কষ্ট করে পুন্য করলো, আর তার ফলভোগ করছে আমার মত মহাপাপী! এতে ঐ ভদ্রলোক, ধরুন ঈশ্বর অক্ষয় ঘোষাল - সে বেচারা কি পেল?

- স্যার, প্রয়াত ঐ অক্ষয়বাবুর আত্মাইতো তার পুণ্যফল ভোগ করছেন আপনার শরীরের মাধ্যমে।

- মেনে নিলাম আপনার কল্পনা বা অনুমান। ধরে নিলাম আপনার যুক্তি একেবারে খাঁটি বাস্তব। কিন্তু মৃত অক্ষয়বাবুর আত্মা আমার মাধ্যমে তাঁর পুণ্যফল ভোগ করলেও সেই অক্ষয়বাবুর যে এতে কোনো লাভ হয়নি সেটা আমার চেয়ে বেশি আর কে জানে? তিনিতো আর ম্যাসাঞ্জোর শান্তিনিকেতন বা এই বাংলাবিলাস, আপনাদের দেওয়া ভেটবিলাস উপভোগ করতে পারছেননা। ফাঁক থেকে ভোগ করছে আপনাদের এই বোসসাহেব। গাছ লাগলো একজন,আর তার ফল ভোগ করলো তার অপরিচিত অনাত্মীয় অন্য একটি মানুষ। আমি আমার আত্মার প্রাক্তন মালিক ও পুন্যপুষ্টকারী অক্ষয়বাবুকে কৃতজ্ঞতা জানানোতো দূরের কথা, তাঁকে চিনিই না।

- এরকম কথাতো জীবনে শুনিনি। একটু ধাতস্থ হতে দিন। আর একবার আর একটু সরল সহজ করে বলুন স্যার। এরকম ব্যাখ্যা কোনো শাস্ত্রে পড়িনি আগে।

- আচ্ছা, ঠিক আছে। কয়েকটা কাল্পনিক উদাহরণ দিই। ধরুন আপনি শীঘ্র আপনার ভগবানের সাথে মিলিত হবার বাসনায় আত্মহত্যা করার জন্য গলায় দড়ি দিলেন। পুলিশ এসে সিলিং ফ্যান থেকে আপনাকে নাবিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতে ডাক্তারবাবু 'braught dead' লিখে ডেথ সার্টিফিকেট দিয়ে দিলেন। আর কোন দেরি না করে আপনার দেহ থেকে আপনার চোখদুটো উপড়ে নিয়ে তৎক্ষণাৎ ওটাকে একটি অন্ধ মানুষের চক্ষুকোটরে বসিয়ে দিলেন কোন এক চোখের সার্জন। সেই অন্ধ মানুষটি তখন আপনার চোখ দিয়ে পৃথিবীর স্বর্গীয় দৃশ্য দেখবে। কিন্তু আপনি কিছুই দেখতে পাবেন না। কেননা আপনার অপটিক্যাল নার্ভগুলি সেই অন্ধ বেক্তিটির মাথায় জুড়ে গেছে। সেই একইভাবে আপনার মৃত্যুর পর স্বামী নিগুড়ানন্দজীর মত কোন আত্মা স্পেশালিস্ট সার্জন ব্রেনডেথের কারণে মৃত কোন এক আত্মাহারা বেক্তির দেহে আপনার পুণ্যপুষ্ট আত্মাটিকে বৈদিক পদ্ধতির সাহায্যে আপনার দেহের আত্মাকোটরে ঢুকিয়ে দিলেন। সেই মৃত ব্যক্তির মৃতদেহটি আত্মা ফিরে পেয়ে জীবন্ত হয়ে উঠবে। আর আপনার চক্ষু পাওয়া অন্ধ মানুষটির পৃথিবীদর্শনভোগের মত আপনার কষ্টার্জিত পুণ্যফল ভোগ

করবে আপনার পবিত্র আত্মার দখল পেয়ে। যেমন আপনার চোখটি অন্ধমানুষটির চক্ষুকোটরে ঢুকে তাকে দৃষ্টিশক্তি দিলেও আপনি কিছু দেখতে পাবেননা, তেমনি আপনার আত্মাটা আপনার পরজন্মের দেহে থাকলেও আপনি অর্থাৎ নবজন্মের দেহটি পাবে লবডঙ্কা।

আবার দেখুন, এই যে সব ধনী,কোটিপতি, দুর্নীতিগ্রস্থ মাননীয় নেতা মন্ত্রী,সম্মানীও কয়লামাফিয়া গরুপাচারকারী অথবা প্রণম্য অসৎ চাকরীচোর শিক্ষক ইত্যাদি চোরাকারবারিরা রাজবিলাস উপভোগ করছে, ঠান্ডা গাড়িতে বেড়িয়ে স্বর্গসুখ ভোগ করছে, তাদের আত্মাগুলি নিশ্চই পূর্বজন্মে সফল গুরুবাবা অথবা আপনার মত পুণ্যাত্মার মানুষের ছিল। সেইসব পূজ্য দেবতাসমান মানুষদের বিদেহী আত্মা পূর্বজন্ম অর্জিত পুণ্যের প্রভাবে আজ এ জন্মে নেতা মন্ত্রীসুখ, চোরাকারবারীসুখ ইত্যাদী নানা সুখ ভোগ করছে। হতভাগ্য ঐসব আহম্মকদের এত কষ্টের অর্জন করা পুণ্যের ফলভোগ করছে কিনা আমার মত পাপী তাঁদের অপরিচিত মানুষেরা !

এবার ঐ রাস্তার কুষ্ঠরোগীটির দিকে তাকান, কিংবা কোন জন্মান্ধ বা কোন জন্মবিকলাঙ্গ শিশুটির কথা ভাবুন। কত কষ্ট পাচ্ছে তারা। জীবিত অবস্থাতেই নরকযন্ত্রণা। অথচ ওরা জন্মের দিন কোনো সুযোগই পায়নি পাপ করবার। ওদের আত্মার পূর্বতন মালিকরা, মনে করুন আমার মত নাস্তিক মহাপাপী কোন বোস

সাহেব অথবা পাপিষ্ঠ চূড়ামনি প্রয়াত হিটলার যত পাপ করেছিল ওদের জীবিত অবস্থায়, তাদের কর্মফল ভোগ করছে ঐ কুষ্ঠরোগীট বা জন্মান্ধ, জন্মবিকালঙ্গ মানুষগুলো! আপনাদের শাস্ত্রীয় অনুমান অনুযায়ী প্রয়াত হিটলারের আত্মা তথাকল্পিত ঈশ্বরদের বিচারে ঐ হতভাগ্য মানুষগুলির শরীরে আশ্রয় পেয়ে শাস্তিভোগ করলেও হিটলার স্বয়ং কিন্তু কোনও শাস্তি পাচ্ছে না। কি অবিচার!

তবে হ্যাঁ, যদি আপনি মারা যাবার পর আপনার মন মগজটাও আপনার আত্মার সাথে সাথে আপনার উত্তরজন্মের মানুষটির দেহে ট্রান্সফার করে দেওয়া যেত, তাহলে হয়তো আপনার ইহজন্মের পুণ্যফল বা পাপফল আপনিই ভোগ করতে পারতেন। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে প্রকৃতি সে ব্যবস্থা রাখেনি। আর আপনাদের পবিত্র শাস্ত্রগুলোও আপনাদের মগজগুলোকে আত্মার মত অবিনশ্বর করে সৃষ্টি করেননি। সাধুসন্তরা আত্মার মত মন অর্থাৎ মগজটাকে শ্রাদ্ধশান্তির সময় দেহান্তরে চালান করবার ফন্দিফিকির শেখাননি পুরুতঠাকুরদের। মরার পর আপনার তথাকল্পিত অবিনশ্বর আত্মা বেঁচে থাকলেও আপনার মন ও স্মৃতি আর কার্যকরী থাকছে না। অর্থাৎ আপনিও আর থাকছেন না। স্বর্গেও না, মর্ত্যেও না। কেন না আপনার মৃত্যুর সাথে সাথে আপনার মরণশীল স্নায়ুতন্ত্রটি ধংশপ্রাপ্ত হবে। আর আপনার পূর্বজন্মের মন চিন্তা করতে না পারলে আপনার অস্তিত্ব আর থাকে কী

করে? আমার বর্তমান মন যদি আমার মৃত্যুর পরেও চিন্তা করতে পারত, অন্তত আমার আত্মাটাও যদি তা করতে পারত, তাহলে আমিই আমার পুন্যকাজের পুরস্কার বা পাপের শাস্তি পেতে পারতাম। আর তা যে সম্ভব নয় তার প্রমান আমি আপনি সবাই। কেউই আমরা তথাকথিত তথাকল্পিত আমাদের পূর্বজন্মের আত্মাধিকারীর স্মৃতির উত্তরাধীকার পাইনি। অতএব আপনার মৃত্যুর পর আপনার পাপ পুণ্যের ফলাফল ভোগ করবার কোন আশা নেই। যান, মরে যাবার আগে বাড়ি গিয়ে বুড়িকে নিয়ে নাইট শো দেখে আসুন।

- চার -

সেদিন বাড়ি ফিরে সারারাত এতটুকু ঘুমাইনিরে দাদুভাই। মনে হলো ধম্মকম্ম করতে করতে আমার মনুষ্যসুলভ যুক্তিবাদী স্বত্বাটি (rationalist) আমার মনের অজান্তে উবে গিয়ে ধর্মময় হয়ে গেছে। যুক্তিবাদী মন হারিয়ে আমি আর মানুষ নেই। মননহীন পশু হয়ে গিয়েছি। সাহেবের কথাগুলো ভাবছি আর ঘামছি। চোখে নিদ্রা নেই। তোদের দিদাকে সব কথা বললাম খুলে। তখন তারও আমার মত সেই একই অবস্থা।

ভোর রাতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল একটা কুস্বপ্ন দেখে। স্বপ্নে দেখলাম আমি মরে গেছি। আমার দেহটাকে মর্গের থেকে নিয়ে যাবার আগে গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিককে দেখি এক ডাক্তারবাবু

আমার মগজ বা মনের কলা, অর্থাৎ পুরো স্নায়ুতন্ত্রটা গোপনে একটা বোয়ামে রেখে দিলো অ্যালকোহলে চুবিয়ে। তবে আমার আত্মাটাকে কব্জা করতে পারল না সে। ফুড়ুৎ করে উড়ে মর্গের ঘুলঘুলি দিয়ে পালিয়ে গেলো সে আত্মাটা। সেঁধিয়ে গেল সেটা আমার জন্মশুত্রু রামহারামী ফিরোজ উকিলের পুত্রবধূর পেটের ছেলেটার দেহে। বাকি দেহটা তোদের মামারা 'বলহরি বলহরি' বলতে বলতে চলতে লাগলো নিমতলার দিকে। কিন্তু তখনও আমি, মানে বোয়েমে রাখা আমার মনটা সব ভাবতে পারছে পুরান জীবনের কথা। দেখলাম সে হতচ্ছাড়া আমার আত্মধারী ম্লেচ্ছ নাতিটা আমার পুণ্যাত্মার দখল পেয়ে সুন্দর চেহারা, স্কুল কলেজের পরীক্ষায় সুন্দর ফল, লটারির পুরস্কার, আমার বাঁধা মক্কেল, মদের দোকানের লাইসেন্স - সব কিছু হাতাচ্ছে। অকৃতজ্ঞ অব্রাহ্মণটা আমাকে একটা ধন্যবাদও পর্যন্ত দিচ্ছে না। ম্লেচ্ছ নাতিটার ব্রাহ্মণ আত্মাটা গায়ত্রীমন্ত্র ভুলে আল্লা আকবর বলে আজান দিচ্ছে গলা ফুলিয়ে। কেমিক্যালে ডোবানো আমার মন-আমার মগজের সাহায্যে বোতলের কাঁচের ভেতর দিয়ে স্পষ্ট দেখলাম সব।

ঘেমে নেয়ে একসা হয়ে ঘুম ভেঙে ভাবতে লাগলাম আকাশ পাতাল। আমৃত্যু এত কষ্টে তিল তিল করে জমানো পুন্যগুলো সব ভোগ করবে কিনা ফিরোজ উকিলের নাতি! আমার ডজন ডজন বাঁধা মক্কেলগুলো ওর চেম্বারে লাইন মারবে ! কোভভি নেহি। সেদিন থেকে সব

ছেড়েছি। এখন আমার স্বর্গের লোভ নেই, নরকের ভয়ও নেই। আর তাই ধর্ম করার দরকারও নেই। আমি এখন ধর্মশৃঙ্খলমুক্ত স্বাধীন সাহসী মানুষ।

কবিতা:

ভরসা

লিখেছেন – প্রদীপ চক্রবর্তী



মানুষ যখন বুদ্ধিভ্রষ্ট
হারায় চিন্তা শক্তি,
তখনই আসে ধর্মগ্রন্থ
বাড়ে অন্ধ ভক্তি।

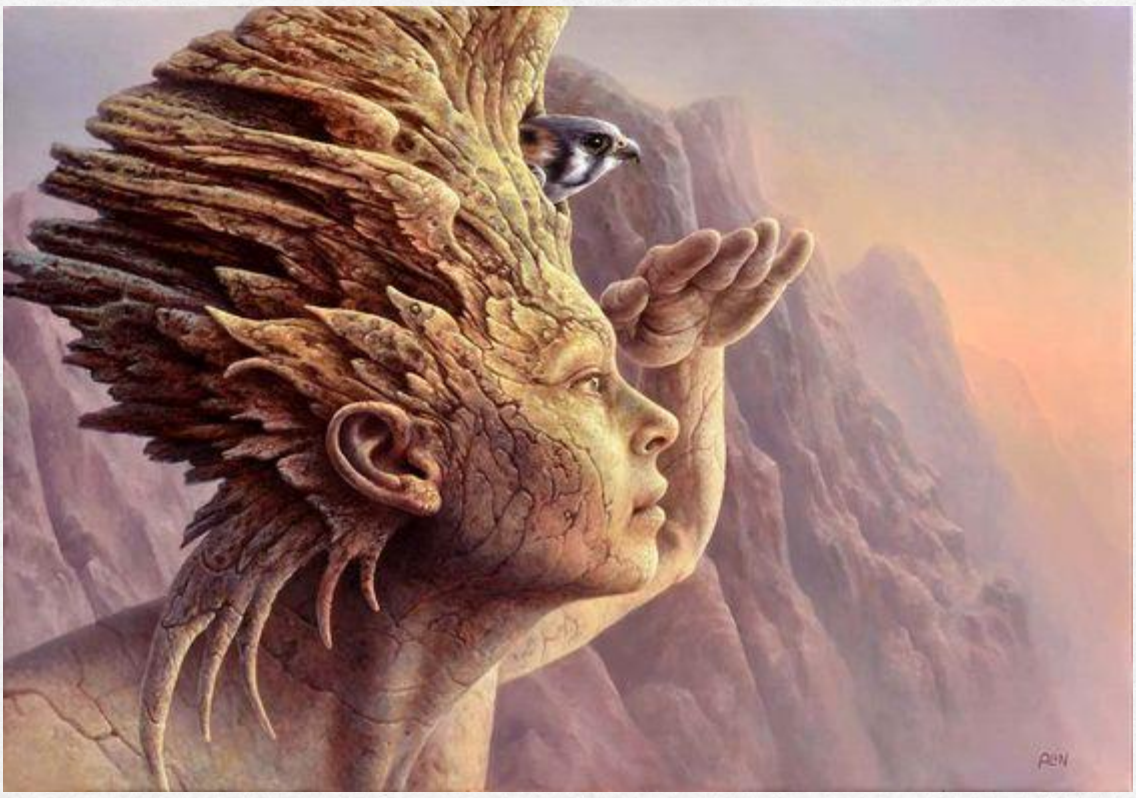
যুক্তি দিয়ে চিন্তা করলে
বাড়ে সমাজের মান,

বিপদ থেকে রক্ষা করতে
আসবে না ভগবান।

মানবতাই পারে শুধু
করতে মন পরিষ্কার,
বিজ্ঞানেতে ভরসা রাখো
দূর করো কুসংস্কার।

থাকুক নির্ভয়ে

লি খে ছে ন – প্রি ন্সি বে রা



মানবজাতি বড়ই অসহায় আজ

মানসিক ঝড়ের কবলে।

কতক আমফান, ফনী, ইয়াশ নামক

বনমানুষের আচরণে।

তুমি আমি প্রার্থনা করি

অভিমুখ পরিবর্তিত হোক

যাক অপরপানে।

শুধু বলি আমরা যেন বেঁচে থাকি,

প্রভাব ফেলুক ভিনরাজ্যে।

ভুলেও ভাবি না গতি হারাক,

এ ভয়ানক রাক্ষস,

ধ্বংস হোক শয়তানের কারবার।

আমার মতই বাঁচুক সবাই,

সবাই থাকুক নির্ভয়ে।।

ধন্যবাদান্তে,

রমা বেরা, শ্রীচন্দা, উস্থি

বিষয় - রাজনীতি

লি খে ছে ন – প রি ণী তা



লাল, সবুজ, কমলা রঙের ছড়াছড়ি

সব মিলে পা চাটে, নেতাদের পায়ে পড়ি।

শহীদের বেদিতে যত জমা পরে ফুল

তার চেয়ে ঢের বেশি মানুষ দু'টাকার চালে মশগুল।

ধর্ষণ যখন হচ্ছে তখন এনজয় করা হোক

এই বলে নেতাদের মুখ বাঁচিয়ে নেওয়া হোক।

যখন তার মেয়ে বৌ ও ধর্ষণ হবে

তখন যেন আদালতে দেখা যায় না তবে!

তখন বিচার চাইলে আমরাও বলি?

ধর্ষণ তো কি হয়েছে? এনজয় করি!

বিখ্যাত শিল্পীর সিনেমা নন্দনে শো না পায়

এদিকে জামা খুলে মডার্ন শিল্পী কোমর নাচায়।

এ দেশে শিক্ষা নিয়ে দিনরাত চলছে ব্যবসা

ওদিকে এক্সাম এলেই বাড়ছে করোনা।

পেটের দায়ে শরীর বেচা বেশ্যাকে ঘৃণা করি

ফেসবুকে "শাড়িতেই নারী" নামে স্তন এর ভাঁজকে লাইক করি।

লাল, সবুজ কমলা রঙের ছড়াছড়ি

সব মিলে পা চাটে, নেতাদের পায়ে পড়ি।

নিখিলেশ

লি খে ছে ন – রা জু দ ত্ত



নিখিলেশকে মনে আছে?

লম্বা ছিপছিপে পাঞ্জাবি পরা ছেলেটি...

এলোমেলো চুল, গালে খোঁচা দাঁড়ি

গোঁফের ফাঁকে প্রসারিত ঠোঁটে

লেগে থাকা স্নিগ্ধ হাসি....

নিখিলেশ.. ওরও হিস্ট্রি ছিল।

তবে দখলটা ছিল সকলের বিস্ময়

অথবা ঈর্ষার।

দুনিয়ার বিকৃত ইতিহাসটাকে দুমড়ে মুচড়ে
নতুন করে গড়বার নেশায় মশগুল
মফ:স্বলের ছেলেটার অতীত জানতে চায়নি কেউ।

নিখিলেশ ছিল হরপ্পা লিপির মত,
আমাদের সমবেত প্রচেষ্টায়
যার পাঠোদ্ধার হয়নি আজও।
আমাদের কলেজ দিনের স্মৃতিতে
শুধু রয়ে গেছে অবিন্যস্ত নিখিলেশ
ওর এলোমেলো অবিন্যস্ত চুলের মত।

জিনসটি শার্ট পরা সেদিনের আমরা,
সেন্ট পাউডারে সুরভিত আমরা
ছিলাম আধুনিকতার মলাটে
কুসংস্কারের নতুন সংকলন।
আর আমাদের নিখিলেশ!
যুক্তির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত কুসংস্কারগুলো
ওর তর্জনির ইশারায় জমেছে আবর্জনার স্তুপে।

প্রতিবাদে মুখর নিখিলেশই

ছিল নীরব আন্দোলন।

ঝোলাব্যাগ ঢোলা প্যান্ট পাঞ্জাবি

এলোমেলো চুল না কামানো খোঁচা দাঁড়ি

ঘুণ ধরাতে পারেনি ওর চেতনায়।

মাদুলি তাবিজ পরা ফিজিক্সের অর্ক মধুরিমাদের পাশ
দিয়ে হেঁটে গেছে হিস্ট্রির নিখিলেশ..

একা একলাই....

আমরা চিনিনি ওকে

পাগল বলেছে লোকে

আজকে দীর্ঘশ্বাস

প্রগতির গতি রোধ করে বিকৃত ইতিহাস,

নিখিলেশদের প্রয়োজন আজ

প্রতিদিন বারোমাস।

রচনাকাল :- ১২/০৯/১৯

প্রকাশকাল :- ২৭/০৩/২১

জ্যোতিষ বুজরুকি

লিখেছেন – তন্ময়



টিয়া পাখি,ল্যাপটপ জ্যোতিষী মহাঢপ
দুর্বল মানুষদের ধরে ওরা খপাখপ,
হাত দেখে বলে দেয় ভাগ্যেতে কী লেখা
হাত যার নেই তবে পাবে কোথা তার রেখা,
শিম্পাঞ্জি,ওরাংওটাং,ওদেরও রেখা থাকে
কেউ কেন পড়ে না তবে ওদের ভাগ্যটাকে।

গ্রহের কোপে পড়লে চলে না জারিজুরি
রাহু, কেতু গ্রহ নাকি? মিথ্যের ফুলঝুরি,
সূর্য, চন্দ্র এসব গ্রহ আবার হল কবে?
ইউরেনাস নেপচুনের নাম কেন বাদ তবে?
আসলে পুরোটাই মিথ্যার বেসাতি
ফন্দিফিকির করে ঠকানোর কেরামতি।
সময়, লগ্ন, রাশি কতসব কায়দা
ফাঁদ পেতে বসে থেকে ওরা তোলে ফায়দা,
জন্ম মুহূর্ত এক হলে সমান ভাগ্যবান
জ্যোতিষীরা পারে না দিতে এরূপ কোনও প্রমাণ।
গ্রহরত্ন পরলে নাকি ভাগ্য বদলে যায়
ছেদ পড়ে কখনো কি শোষণ বঞ্চনায়?
সবার কর্ম জোটে? দারিদ্র্য যায় ঘুচে?
হয় না এসব কিছুই আসলে সবই মিছে।
অনিশ্চিত জীবনে অনেকের করে ভয়
জ্যোতিষীরা সেই দুর্বলতার সুযোগ নেয়,
জ্যোতিষ বিজ্ঞান নয়,পুরোটাই বুজরুকি
প্রতারণার বিরুদ্ধে চলো প্রতিরোধ গড়তে থাকি।

বি শে ষ সং যো জ ন:

সূচিপত্র

আধুনিক বিজ্ঞান ও হিন্দুধর্ম

লি খে ছে ন – অ ধ্যা প ক শ্রী মে ঘ না দ সা হা

ডি-এস-সি, এফ-আর-এস



ভূমিকা

গত নভেম্বর মাসে আমি কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থ শান্তিনিকেতনে গমন করি এবং কবির অনুরোধে তথায় শিক্ষক ও ছাত্রমণ্ডলীর সম্মেলনে একটি বক্তৃতা প্রদান করি ; স্বয়ং কবি এই বক্তৃতায় উপস্থিত থাকিয়া আমাকে অনুগৃহীত করেন। এই বক্তৃতা সমস্ত দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হয়। তাহার পর হইতে দৈনিক ও মাসিক পত্রে উক্ত বক্তৃতার বহু সমালোচনা বাহির হয়। সেই সময় হঠাৎ অস্ত্রোপচারে শয্যাগত থাকায় আমি যথাসময়ে এই সমস্ত

সমালোচনার উত্তর দানে অসমর্থ হই। সম্প্রতি গত বৈশাখের 'ভারতবর্ষ'-এ পণ্ডিচেরী-প্রবাসী শ্রী অনিলবরণ রায় আমার বক্তৃতার বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ গড়িয়া তুলিয়াছেন। দুঃখের বিষয় উক্ত প্রবন্ধ পাঠে প্রতীত হয়, তিনি আমার বক্তৃতার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন নাই, পরন্তু নানারূপ কল্পিত অর্থ করিয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন; তজ্জন্য এই উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য সর্বপ্রথম আমার শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বক্তৃতার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল।

শান্তিনিকেতন-প্রদত্ত বক্তৃতা

"কবি আপনাদিগকে তাহার নিজস্ব অতুলনীয় ভাষায় বহুবার তাহার আত্মজীবনের আদর্শ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আদর্শ ব্যাখ্যার প্রয়োজন কি ? এই পৃথিবীতে বহু সভ্যতা উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইয়াছে, বহু এ পর্যন্ত বর্তমান রহিয়াছে। আপনারা যদি কোনও সভ্যতার মূল উৎস অনুসন্ধান করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, প্রত্যেক সভ্যতার কার্যপ্রণালী উচ্চ জীবনের আদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। আদর্শই সভ্যতার গতি নির্ণয় করে এবং প্রথম হইতেই আদর্শের প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করিতে পারিলে অনেক ভুল-ভ্রান্তি ধরা পড়ে। অনেক পুরাকালোৎপন্ন ধর্ম ও দর্শনের মূলসূত্র এই যে, বিশ্বজগৎ কোন সৃষ্টিকর্তার দ্বারা সৃষ্ট ; কিন্তু 'সৃষ্টিকর্তা

সমস্ত ধর্ম্মে একবিধ নন। প্রাচীন ইহুদীজাতীয় ধর্মশাস্ত্রে সৃষ্টিকর্তা আইন ও শৃঙ্খলার দণ্ডধার। তাহার আদেশ যে সকলেই বাইবেল-কথিত দশটি নিয়ম প্রতিপালন করিবে এবং যাহারা তাহার অন্যথা করিবে তাহাদিগকে অশেষ দুর্গতি ভোগ করিতে হইবে। আরও অনেক ধর্ম্ম মূলতঃ ইহুদীধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সকল ধর্ম্মে ‘সৃষ্টিকর্তার রূপ ইহুদীদের সৃষ্টিকর্তা হইতে খুব বেশী তফাৎ নয়।

ধর্ম্মে অসহিষ্ণুতা

যাহারা এইরূপ দর্শনের অনুসরণ করেন তাহাদিগকে কোনও গ্রন্থবদ্ধ নিয়ম পালন করিতে হয়। এই গ্রন্থবদ্ধ নিয়ম ভগবানের বাণী বা প্রত্যাদেশ বলিয়া গৃহীত হয়। এই সকল নিয়ম যাহারা রক্ষা করেন ও ব্যাখ্যা করেন তাহারা সমাজের শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য হন, ভিন্ন মত ইহারা সহিতে পারেন না।

যদি প্রাচ্যতম দেশের দিকে তাকাই তবে দেখিতে পাই— প্রাচীন চীনজাতির মধ্যে সৃষ্টিকর্তাকে কারিকররূপে

কল্পনা করা হইয়াছে। তিনি হাতুড়ি পিটাইয়া ও কুঠার দ্বারা পাহাড় কাটিয়া সমস্ত পৃথিবী সৃষ্টি করিয়াছেন।

সেইজন্য চীনদেশে খুব বড় বড় কারিকর ও স্থপতির সৃষ্টি হইয়াছে এবং চৈনিক সভ্যতায় শিল্পীর স্থান অন্যান্য

সভ্যতার তুলনায় অনেক উচ্চে। চীন-সমাজে সম্মানের পর্য্যায় রাজকর্মচারী (Mandarins), কৃষক ও শিল্পী,

বণিক ও যুদ্ধজীবী। হিন্দুর সৃষ্টিকর্তা একজন দার্শনিক। তিনি ধ্যানে বসিয়া প্রত্যক্ষ জগৎ, স্থাবর ও জঙ্গম, জীব

এবং ধর্ম্মশাস্ত্রাদি সমস্তই সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য যাহারা মাথা খাটায়, অলস দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনায় সময় নষ্ট করে এবং নানারূপ রহস্যের কুহেলিকা সৃষ্টি করে, হিন্দু সমাজে তাহাদিগকে খুব বড় স্থান দেওয়া হইয়াছে। শিল্পী, কারিকর ও স্থপতির স্থান এই সমাজের অতি নিম্নস্তরে এবং হিন্দু সমাজে হস্ত ও মস্তিষ্কের পরস্পর কোন যোগাযোগ নাই। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, সহস্র বৎসর ধরিয়া হিন্দুগণ শিল্পে ও দ্রব্যোৎপাদনে একই ধারা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছে এবং তজ্জন্য বহুবার যান্ত্রিক বিজ্ঞানে উন্নততর বৈদেশিকের পদানত হইয়াছে।

প্রত্যেক সভ্যতার আদশেই ভুল ত্রুটি আছে এবং বর্তমানে সমস্ত-প্রাচীন, ধর্মাত্মক আদর্শই অসম্পূর্ণ বলিয়া

প্রতিপন্ন হইয়াছে ; কারণ এই সকল ধর্ম তথা আদশ 'বিশ্বজগতের যে ধারণার উপর প্রতির্ষ্ঠিত সেই ধারণা নিছক কল্পনামলক। প্রাচীনেরা মনে করিতেন, পৃথিবীই বিশ্বজগতের কেন্দ্র, তারকাগুলি ধার্ম্মিকলোকের আত্মা এবং মূখ্য ও অপরাপর গ্রহ মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। প্রায় সকল প্রাচীন ধর্মেই কল্পিত হইয়াছে যে, পূর্বে এক সত্যযুগ ছিল, তখন মানুষ পরস্পর সম্প্রীতি-সুত্রে বাস করিত এবং তাহাদিগকে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে ভুগিতে হইত না। এখন আমরা জানি যে, এইরূপ সত্যযুগের ছবি ভ্রমাত্মক। পৃথিবী বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠ জিনিস নয়, ইহা বিরাট সূর্যের একটি স্ফুলিঙ্গ মাত্র। প্রাচীনকালে ইহা সূর্যদেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্রমে শীতলতাপ্রাপ্ত হইযাছে। প্রথমে পৃথিবীতে মানুষ দুরে থাকুক, কোনওরূপ জীবের অস্তিত্ব ছিল না। পরে সর্বপ্রথম অতি নিম্নস্তরের জীব উদ্ভূত হয় এবং ক্রমবিকাশের ফলে অতি আধুনিক কালে বর্তমান মানবের উদ্ভব হয়। সুতরাং ঈশ্বর ধ্যানে বসিয়া এক নিঃশ্বাসে সশস্ত জগৎ, মানুষ ও জাননায়ারের সৃষ্টি করেন নাই।

সহস্র সহস্র বৎসরের অভিজ্ঞতা ও পরস্পরাগত জ্ঞানরাশির উপর বর্তমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। এই দীর্ঘ সময়ে যাবতীয় শিল্প, কৃষি ও বাণিজ্যে অনেক নব নব প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এই সকল আবিষ্কারের ফলে সমাজে বহুবার

বিপ্লব সংঘটিত হইয়াছে এবং নূতন ভাবে সমাজগঠন করা হইয়াছে। এক কথায় বলতে গেলে বহুসহস্রবর্ষব্যাপী অতীতের পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার উপর বর্তমান সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। বর্তমান যুগের বিশেষত্ব এই যে, মানুষ আপনার হস্ত ও মস্তিস্ক সমানভাবে খাটাইয়া আপনাকে প্রস্তুত করে। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে পৃথিবী হইতে আমাদিগকে শক্তি, খনিজদ্রব্য ও কৃষিজাত দ্রব্য সম্যক উৎপাদন করিতে হইবে। ভারতবর্ষে এই যে 'জীবনধারণের জন্য সংগ্রাম' ইহা শেষ হয় নাই, মাত্র সুরু হইয়াছে। কিন্তু এই জীবন সমস্যার সমাধানের জন্য অনেকে বলেন যে আমাদিগকে শহর হইতে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুটীর ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করিতে হইবে। একটু ভাবিয়া দেখিলেই এই সমস্ত যুক্তির অসারতা বুঝা যায়। বৈজ্ঞানিকের স্বভাব সর্বদা সংখ্যার সাহায্যে চিন্তা করা। আমাদের দেশে একজন সাধারণ লোক যে পরিমাণে কার্য করে, তাহার সহিত য়ুরোপ ও আমেরিকার সাধারণ লোকের কৃত কার্যের তুলনা করা যাউক। অনায়াসে প্রমাণ করা যায় (এবং অন্যত্র আমি প্রমাণ করিয়াছি) যে আমরা ভারতবর্ষে জন পিছু পাশ্চাত্যের কুড়িভাগের একভাগ মাত্র কার্য করি। তাহার কারণ, পাশ্চাত্য দেশে যত প্রাকৃতিক শক্তি আছে— যেমন জলধারার শক্তি, কয়লা পোড়াইয়া তজ্জাত শক্তি- তাহার অধিকাংশই কার্যে লাগান হইয়াছে। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে একটা ঘোড়া মানুষের দশ গুণ কার্য্য করিতে সমর্থ এবং য়ুরোপ ও আমেরিকায় যন্ত্রযোগে যে

শক্তি উৎপাদন করা হয়, তাহা বৎসরে মাথা পিছু একটা ঘোড়ার ২৪ ঘণ্টাব্যাপী ৩৬৫ দিনের কার্যের সমান। আমাদের দেশে শক্তির অভাব নাই, কিন্তু মাত্র শতকরা দুই ভাগ কার্যে লাগান হইয়াছে। অধিকাংশ কার্যই হস্তে সম্পন্ন হয়, অতএব, মোটের উপর এ দেশে লোকে মাথা পিছু ২০ গুণ কার্য্য কম করে। তজ্জন্য আমরা য়ুরোপ ও আমেরিকা ইত্যাদি উন্নত দেশের তুলনায় ২০ গুণ বেশী গরীব। দেশকে সমৃদ্ধ করিতে হইলে দেশের যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে লাগাইতে হইবে এবং সেই ভিত্তির উপর যান্ত্রিক সভ্যতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

গ্রাম্যজীবনের পবিত্রতা সম্বন্ধে আমি কোনও অলীক আশা পোষণ করি না। আমি মনে করি না যে গ্রামগুলি বসতির দিক হইতে আদর্শস্থানীয়। যদি শহরবাসী লোক জীবিকা নির্বাহের জন্য গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তাহা হইলে তাহারা কেবল গ্রামের যাবতীয় সমস্যাকে জটিলতর করিয়া তুলিবে। গ্রামে ফিরিয়া গেলেই জীবিকানির্বাহের জন্য গ্রামবাসীদিগের সহিত আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাগিবে, গ্রামবাসীরা আমাদের ভাল চোখে দেখিবে না। গ্রামবাসীগণ

কি চায়? তাহারা চায় ভাল ঘরবাড়ী, পর্যাপ্ত খাদ্য ও বস্ত্র এবং জীবনে অপেক্ষাকৃত প্রচুর অবকাশ ও প্রাচুর্য্য। যদি দেশে প্রচুর কার্যের সৃষ্টি করা হয়, তাহা হইলে এই সমস্ত

সমস্যার সমাধান হয়। প্রচুর পরিমাণ কার্যের সৃষ্টি করিলে দেশের যে কেবল দুঃখ ও দারিদ্র্যের সমাধান হয় তাহা নহে, আমাদিগের আত্মরক্ষার খাতিরেও কার্য্য – সৃষ্টির একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় দিক হইতেই বৈদেশিক আক্রমণের মহা আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে। যদি কোনও দিন এই আশঙ্কা বাস্তবে পরিণত হয় এবং যদি আমরা পুনর্বার বিদেশীয়গণের পদানত হইবার ইচ্ছা না করি—তবে আমাদিগকে য়ুরোপ ও আমেবিকার মত যান্ত্রিক সভ্যতায় শ্রেষ্ঠত্বলাভ করিতে হইবে। ভারতের অনেক শুভাকাঙ্খী আছেন, তাহারা বলেন যে ভারতবর্ষের পক্ষে চিরকাল কৃষি প্রধান হইয়া থাকা উচিত। এই মত অত্যন্ত দুরভিসন্ধিমূলক বলিয়া মনে করি। যদি আমরা সকলেই গ্রাম্যজীবনে ফিরিয়া যাই, তাহা হইলে মুষ্টিমেয় পুজিবাদীদের পক্ষে শোষণ করা সহজসাধ্য হইয়া পড়ে। পাশ্চাত্য দেশে যাবতীয় “চাবি-শিল্প” – যেমন শক্তি উৎপাদন, যন্ত্রপাতি তৈয়ার, যাতায়াত ও রাস্তাঘাট সম্বন্ধীয় শিল্প ইত্যাদি—সমস্যই রাষ্ট্রের পরিচালনাধীন এবং কখনও কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের খাতিরে এই সমস্ত শিল্পকে রাষ্ট্রের ক্ষমতা-বহির্ভূত হইতে দেওয়া হয়না। এ দেশেও এই প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে, যেমন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে চীনের উদ্ধারকর্তা Dr. Sanyat Sen চীনের জন্য পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। এইরূপে দেশকে শিল্প প্রদান করিতে হইবে, রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে মূলধন তুলিয়া দেশে নানাবিধ নূতন শিল্পপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে এবং তাহা

হইলেই আমাদের দেশ য়ুরোপ ও আমেরিকার ন্যায় সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইবে।

রুশিয়ার অনুকরণ নয়

"এই প্রকার দেশব্যাপী শিল্পপরিকল্পনা রুশিয়ার পরিকল্পনা নহে। যদি কোন আদর্শকে ফলবান্ করিতে হয়, তাহা হইলে উহাকে কেবল বস্তুবাদের উপর প্রতিষ্ঠা করাই যথেষ্ট নয়। রশিয়ার বর্তমান জাতীয় জীবন খানিকটা অপূর্ণ, কারণ এখানে আদর্শে ও কার্যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সম্পূর্ণ অভাব। যদি আমরা আমাদের সভ্যতার উৎসকে

পুনরুজ্জীবিত করিতে চাই, তাহা হইলে আমাদের। জীবনাদর্শকে সামাজিক মৈত্রী, সার্বজনীন প্রীতি ও নৈতিকতার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।"

এই বক্তৃতা সম্বন্ধে সমালোচক বলিয়াছেন—"লব্ধপ্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক ডক্টর মেঘনাদ সাহা সম্প্রতি শান্তিনিকেতনে হিন্দুর দশন ও হিন্দু ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতকগুলি মন্তব্য প্রকাশ করিয়া যে বক্তৃতা দিয়াছেন তাহাতে তিনি কোনও মৌলিক গবেষণার পরিচয় দেন নাই ; পরন্তু এ বিষয়ে অজ্ঞ ও পক্ষপাতদুষ্ট পাশ্চাত্য সমালোচকগণের কতকগুলি মামুলি, কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।"

আমার বক্তব্য- কোনও লোক এত বড়ই হউন স্বীকার না করিয়া তাহার কথার প্রতিধ্বনি করা শনার স্বভাব নয়। আমার বক্তৃতা সম্পূর্ণ মৌলিক। আমি কোন্ পাশ্চাত্য সমালোচকের মামুলি কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছি—তাহার বা তাহাদের নাম, ধাম ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রামাণ্য উল্লেখ উপস্থিত করিলে বাধিত হইব। যদি তিনি তা না করিতে পারেন তাহা হইলে তাহার উচিত এই উক্তি প্রত্যাহার করা। হিন্দুধর্ম ও দর্শনের অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমার মন্তব্য তাহার রুচিকর না হইতে পারে, কিন্তু বিনা প্রমাণে কাহাকেও অন্যের উক্তির প্রতিধ্বনিকারী বলিয়া অপবাদ দেওয়া একান্ত ভদ্রজন বিগর্হিত বলিয়া মনে হয়। পুনরায় তিনি বলিয়াছেন, "হিন্দুর দর্শন, হিন্দুর ধর্ম ও ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিবার জন্য ডক্টর সাহা যদি কিছুমাত্র চেষ্টা করিতেন, পরের মুখেই ঝাল না খাইতেন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিতেন যে ঐ বিষয়ে ঐরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা তাহার ন্যায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে উপযুক্ত হয় নাই।"

বর্তমান সমালোচকের মত অনেক সমালোচকই বোধহয় কল্পনা করিয়াছেন যে আমি হিন্দুধর্ম্মের ও দর্শনের কোন মৌলিক গ্রন্থ পড়ি নাই। এরূপ ধারণা করিবার পূর্বে একটু অনুসন্ধান করিয়া লইলে বুদ্ধিমানের কার্য হইত। যাহা

হউক, আশা করি এই প্রত্যুত্তর পাঠে তাহার ভ্রান্তির নিরসন হইবে। সমালোচক মোটের উপর বলিতে প্রয়াসী হইয়াছেন যে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনে শ্রেষ্ঠ সভ্যতা গঠনের, এমন কি বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা গঠনের সমস্ত আদর্শই বর্তমান আছে।

সমালোচকের মতে বর্তমান লেখকের মত অনেক অনভিজ্ঞ লোকে অনর্থক বিভ্রান্ত হইয়া বর্তমান সভ্যতার দিকে আকৃষ্ট হয়। তাহার বিশ্বাস যে হিন্দুর দর্শন ও বিজ্ঞানে ক্রমবিবর্তনবাদ (Thcory of Evolution), পৃথিবীর সূর্যপ্রদক্ষিণবাদ (Heliocentric Theory of the solar system) ইত্যাদি বর্তমান বিজ্ঞানের যাবতীয় মূলতত্ব, এমন কি National Planning পর্য্যন্ত স্পষ্টভাবে স্বীকৃত আছে, না হয় বীজাকারে প্রচ্ছন্ন আছে। আমি এই প্রবন্ধে দেখাইব যে সমালোচকের মত শুধু ভ্রান্ত নয়, বিরাট অজ্ঞতাপ্রসূত। পরলোকগত শশধর তর্কচূড়ামণি যখন এইরূপ মতবাদ প্রচার করিতেন, তখন তাহাকে লোকে ক্ষমা করিতে পারিত।

এই সমস্ত মত প্রতিপাদনের জন্য সমালোচক আরম্ভ করিয়াছে–

“হিন্দুধর্ম ও দর্শনের মূল বেদ।”

সমালোচক কি অবগত নহেন যে বিগত ১৯২৩ খ্ঃ অব্দে পরলোকগত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পাঞ্জাবের হরাপ্পা ও সিন্ধুদেশের মহেঞ্জদাররাতে দুইটা অতি প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করিয়াছেন— যাহার ফলে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন ও মোটামুটী ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাচীন ধারণা সম্পূর্ণরূপে বদলাইয়া গিয়াছে। সমস্ত পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও অধিকাংশ দেশী পণ্ডিতের মতে (যেমন রমাপ্রসাদ চন্দ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষেত্রেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বিরজাশঙ্কর গুহ) এই সভ্যতা প্রাগ্বৈদিক ও প্রাক্-আর্য। এই দুইটা নগরী অনুমানিক ৩০০০ পূঃ খৃঃ অব্দ হইতে ২৫০০ পূঃ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। এই দুই নগরের ধ্বংসাবশেষে বৈদিককালীন সভ্যতা বা অসভ্যতার কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় না। সম্প্রতি প্রত্নতত্ত্ববিভাগ আবিষ্কার করিয়াছেন যে এই সিন্ধুনদীবাহিত সভ্যতা দক্ষিণে গুজরাট ও পূর্বে গঙ্গাযমুনার অবিবাহিকার উত্তরাংশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং এই সভ্যতা তৎকালীন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার মত উন্নতস্তরের ছিল। বর্তমানে পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের অধিকাংশ উপাদানই উক্ত প্রাগ্বৈদিক, প্রাক-অর্য সভ্যতা হইতে গৃহীত—যেমন শিব-পশুপতির পূজা, ধ্যান, যোগ,ফুলনৈবেদ্য দিয়া পূজাপদ্ধতি এবং সম্ভবতঃ পশু, সর্প ও বৃক্ষদেবতার পূজা (১)

কাজেই হিন্দুর সমস্তই 'ব্যাদে' আছে, একথা প্রস্তরীভূত (fossilized) পণ্ডিতাভিমানী ব্যতীত এই যুগে কেহ বলিতে সাহসী হইবেন না।

তথাকথিত বৈদিক সভ্যতার পরিচয় শুধু ঋগবেদের অতি দুর্বোধ্য ঋক্ গুলি হইতে পাওয়া যাইতে পারে কিন্তু বৈদিক সভ্যতার কোন বাস্তব প্রমাণ (material proof) এপর্যন্ত ভারতবর্ষের মাটিতে পাওয়া যায় নাই। পাওয়া গিয়াছে সুদূর এশিয়া মাইনরে ; প্রায় ১৪৪০ পূঃ খৃঃ অব্দের যে Mitanian জাতির মধ্যে উক্ত বৈদিক সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহারা তৎকালীন মিশরীয় ও বাবিলোনীয় সভ্যতা সম্বন্ধে এতদূর উচ্চধারণা পোষণ করিত যে মনে হয় তাহাদের নিজস্ব সভ্যতা খুবই উচ্চস্তরের ছিল না। অথচ এই সময়ের প্রায় হাজার বৎসর পূর্বে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে প্রায় মিশরীয় সভ্যতার সমতুল্য, সুতরাং বৈদিক সভ্যতা হইতে উন্নতস্তরের প্রাগ্বৈদিক ও প্রাক-আর্য সিন্ধুনদীবাহিত-সভ্যতা প্রচলিত ছিল। সুতরাং ধরা যাইতে পারে, যে "বৈদিক অসভ্যেরা" সভ্যতর ভারতবর্ষ গায়ের জোরে দখল করিয়া নিজেদের শাসন স্থাপন করিলেও ভারতীয় সভ্যতাকে সম্পূর্ণ বেদমূলক করিয়া তুলিতে পারে নাই। বেদের কর্তৃকতার নীচে প্রাচীনতর ভারতীয় সভ্যতার ধারা বরাবরই প্রবাহিত হইতেছে। (২)

লেখক হয়ত পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এতটা ব্যস্ত আছেন যে গত পনর বৎসরের জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে নুতন আবিষ্কারের কথা তাহার কর্ণে পৌছায় নাই এবং ধ্যানে বসিয়াও হয়তঃ অন্তদৃষ্টির দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই; কিন্তু ভারতীয় সভ্যতার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে তাহার "যদি কিছু মাত্র জ্ঞান থাকিত", তাহা হইলে তিনি প্রথমেই এতবড় একটা ভুল কথা বলিতে সাহসী হইতেন না।

প্রত্নতত্বের বিসম্বাদপূর্ণ তর্ক না হয় ছাড়িয়াই দিলাম ; কিন্তু তিনি কি জানেন না যে এই ভারতবর্ষেই সভ্যতার উৎপত্তি সম্বন্ধে সিন্ধুদেশীয় প্রাগ্বৈদিক ও প্রাক্-আর্য্য সভ্যতার আবিষ্কারের পূর্বেও অন্যরকম মতও প্রচলিত ছিল। তিনি কি জানেন না যে—যে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ভারতের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ রচনা করিয়াছিল সেই উভয়ধর্মেই বেদকে সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। তিনি কি জানেন না যে লোকায়ত মতে

এয়ঃ বেদকর্ত্তারঃ ভণ্ড ধূর্ত নিশাচরা।

অর্থাৎ খৃষ্টের কিছু পূর্বে ভারতবর্ষে একদল যুক্তিবাদী ছিলেন, যারা মনে করিতেন যে বেদের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি

করা দুরূহ ; শুধু কতকগুলি ভণ্ডলোকে বেদের অর্থ না জানিয়াও বেদের দোহাই দিয়া ভ্রান্তমত প্রচার করে। এখনও এই শ্রেণীর লোকের অভাব নাই।

সুতরাং হিন্দুর ধর্ম ও দর্শনের গোড়া বেদে খুজিতে যাওয়া প্রায় পনর আনা ভ্রমাত্মক এবং এই ভুলের জন্য সমালোচকের প্রবন্ধটা আগাগোড়া ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া আছে।

লেখক ঋগবেদের দশমমণ্ডলের পুরুষসুক্তে ভারতে প্রচলিত জাতিভেদের গোড়া খুজিতে গিয়াছেন। সকল পণ্ডিতদের মতেই দশমমণ্ডল অত্যন্ত পরবর্তী কালের ; শুধু যখন এই সুক্ত রচিত হয় তৎকাল প্রচলিত জাতিভেদের একটী দাশনিক ব্যাখ্যামাত্র। ইহাতে জাতিভেদের উৎপত্তির কোন ইতিহাস নাই, ইহাতে শুধু প্রচলিত জাতিভেদের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য একটা গল্প মাত্র রচনা করা হইয়াছে।

সুতরাং সমালোচক এই সুক্তটী শুধু পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের জন্য অথবা আমি জাতিভেদপ্রথার যে অপকারিতা বর্ণনা করিয়াছি তাহার অসারতা প্রতিপাদনের জন্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বোঝা গেল না।

লেখকের মতে ঋগবেদের পুরুষসুক্তে প্রচলিত জাতিভেদের দার্শনিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, অর্থাৎ এই সুক্তে রূপকভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে বুদ্ধিজীবী ও ধর্মজীবী লোক স্বভাবতঃই সমাজের 'শীর্ষস্থান দখল করিবে। এই ব্যাখ্যায় আমার কোন আপত্তি নাই—কিন্তু আমার বক্তৃতায় বলার উদ্দেশ্য ছিল—জাতিভেদের সমর্থনকারী এই মত সমাজের উপর বিষময় প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। এই সম্বন্ধে একজন শ্রেষ্ঠ মণীষীর মত উদ্ধৃত করিতেছি :

When the Indians beleived that some of them had sprung from the head, some from the arms, some from the thigh, others from the feet, of their Creator and they arranged their society accordingly; they doomed themselves to an IMMOBILITY from which they have not been able yet to recover, Mazzinni-in the Duties of People..

প্রসিদ্ধ আইনজ্ঞ পণ্ডিত Sir Icury Maine বলিয়াছেন—

Caste is the most BLIGIITING Institution ever invented by the human mind. সুতরাং পুরুষসুক্তকার জাতিভেদের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন, তাহার ভাবনৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া যাওয়া শুধু অসার পাণ্ডিত্যের ভড়ং বই কিছুই নয়—দেখিতে হইবে এই মতবাদ সমাজের উপর কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, সমাজ এই সুক্তকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহার ফল কি হইয়াছে ? সমাজ এই সুক্তের অর্থ গ্রহণ করিয়াছে – যে ব্রাহ্মণজাতীয় লোকে বিরাট পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং ব্রাহ্মণজাতিভূক্ত প্রত্যেকেই বিরাটপুরুষের পাদ হইতে উৎপন্ন শূদ্র জাতীয় লোকের মাথার উপর পাদপ্রসারণ করার অধিকারী। কিন্তু শূদ্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে সে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য মানিবে না, সুতরাং তাহাকে শাস্ত্রশিক্ষার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে হইবে। এজন্য খৃঃ এর প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে মনুমহারাজের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে যে শূদ্র যদি বেদ পড়ে, তাহা হইলে তপ্ত সীসা ঢালিয়া তার মুখ বন্ধ করিতে হইবে। গীতায় কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে

- চাতুর্বর্ণং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।

এইরূপ জাতিভেদ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ প্রচারেও পূর্বোক্ত অনিষ্টকারী মতবাদের কুপ্রভাব কিছুমাত্র খর্ব হয়

নাই। পুরুষসুক্তের উল্লিখিত মতবাদ এদেশে লোকে অক্ষরতঃ বুঝিয়াছে, উহার ফলে এতদ্দেশে, জাতিভেদ অক্ষয় হইয়া বর্তমান আছে এবং স্বার্থান্বেষীদের স্বার্থসাধনের সুবিধা করিয়া দিয়াছে। এই মতবাদ হইতেই—অস্পৃশ্যতা, বর্ণসঙ্করবাদ ইত্যাদি বহু কুপ্রথা ও কুধারণার উৎপত্তি হইয়াছে।

কিন্তু আমি ব্যাপারটা দেখিয়াছি অন্য দিক দিয়া। আমার মতে এই জাতিভেদপ্রথা হস্ত ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন করিয়া দিয়াছে এবং এই জন্য ভারতে বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা ইউরোপ-আমেরিকার বহু, পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। যিনি বুদ্ধিজীবী, তিনি চিরকাল পুস্তকগত বিদ্যা, টীকাটিপ্পনী ব্যাকরণদর্শনের তর্ক নিয়া ব্যস্ত আছেন এবং লোককে বিদ্যার দৌড় দেখাইয়া চমক লাগানই মধ্যযুগের ভারতীয় পণ্ডিতদের আদর্শ ছিল। বাস্তবজীবনের সহিত তাহাদের সংশ্রব খুবই কম ছিল।। তাহার শিল্প বাণিজ্যের উৎকর্ষের জন্য কখনও মাথা খাটান নাই। করিলে হয়তঃ তাহার জাতিপাত হইত। যিনি যুদ্ধজীবী, তিনি তৎকালপ্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র দিয়া নিজের বীরত্ব দেখাইতেই ব্যস্ত ছিলেন ; কখনও এই সমস্ত অস্ত্রের উৎকর্ষ সাধন বা ভিন্নদেশে প্রচলিত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা বা দেশে প্রচলনের চেষ্টা করে নাই। ফলে বৈদিক যুগ হইতে এতাবৎকাল পর্যন্ত আমরা একই প্রাগ্বৈদিক চরকাতেই

সুতা কাটিতেছি, কাঠের তাতে বস্ত্রবয়ন করিতেছি এবং আধুনিককালেও মহাত্মা গান্ধী আমাদিগকে পুনরায় ‘বৈদিক অসভ্যতায় ফিরিয়া যাইতে বলিতেছেন। বস্ত্রবয়ন, ভূমিকর্ষণ, স্থপতিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা ইত্যাদিতে বহুকাল হইতে ভারতে নূতন কোন প্রক্রিয়া উদ্ভাবিত হয় নাই। ইহার কারণ জাতিভেদপ্রথা অনুসারে মস্তিষ্কের কাজকে খুব বড় করিয়া এবং সমস্ত হাতের কাজকে হেয় করিয়া দেখা—সেজন্য মস্তিষ্ক ও হস্তের যোগসূত্র সম্পূর্ণ ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমি আজ প্রায় বিশ বৎসর যাবৎ প্রাকৃতবিজ্ঞানে শিক্ষাদান করিতেছি এবং য়ুরোপ ও আমেরিকার শিক্ষাপ্রণালী বিষয়েও আমার প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে। আমার অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি যে এদেশে ছেলেরা নিজহাতে কার্য করিতে অত্যন্ত নারাজ। আমেরিকায় ছাত্র ও অধ্যাপকগণ নিজহস্তে সূত্রধর, কর্ম্মকার ও অন্যান্য যন্ত্রশিল্পীর কার্য করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নয় ; কিন্তু এদেশে বিজ্ঞানের ছাত্রগণ উক্তরূপ কার্যকে হেয় মনে করে। বুদ্ধিজীবী লোকে যদি নিজহাতে যন্ত্র লইয়া কার্য না করে, তাহা হইলে উক্ত যন্ত্রের উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোন নুতন ফন্দী তাহার মাথায় আসিতে পারে না। য়ুরোপে এই করিয়াই যান্ত্রিক সভ্যতার বর্তমান উন্নতি হইয়াছে। বুদ্ধিজীবী লোকে পুরাতন যন্ত্র দিয়া কার্য্য করার অভিজ্ঞতার ফলে এবং যান্ত্রিকেরা বুদ্ধিজীবী লোকের সংশ্রবে আসিয়া মাথা খাটাইবার ফলে, নব-নব উন্নততর যন্ত্র উদ্ভাবন সম্ভবপর হইয়াছে। য়ুরোপ ও আমেরিকার

যান্ত্রিক সভ্যতার অভূতপূর্ব উন্নতির গোড়ার কথা হস্ত ও মস্তিষ্কের সংযোগ।

বস্ত্রশিল্পের কথাই ধরা যাউক—একজন পণ্ডিত হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে বৈদিক চরকা ও তাঁতের পর বয়নশিল্পে প্রায় ৮০০টী নূতন আবিষ্কার হইয়াছে এবং তাহারই ফলে বর্তমানে বিরাট বয়নশিল্পের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইয়াছে। এই সমস্ত উদ্ভাবনকর্তাদের মধ্যে Hargreaves ছিলেন নিরক্ষর একজন মজুর, Arkwright ছিলেন Penny-barber (অর্থাৎ তিনি এক পেনী নিয়া লোককে কামাইতেন), Cartright ছিলেন গ্রাম্য পাদ্রী। বাস্পীয় যন্ত্রের (Steam ingine)এর উদ্ভাবনকর্তা James Watt ছিলেন কর্মকার ও যন্ত্রসংস্কারক ; তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Black এর সংশ্রবে আসিয়াছিলেন বলিয়াই বাষ্পীয় যন্ত্র উদ্ভাবনে সক্ষম হইয়াছিলেন। সমালোচক বলিয়াছেন-

“মানুষ মনোময় জীব ; দেহ ও প্রাণ অপরিহার্য হইলেও মনের উৎকর্ষই মানবের উৎকর্ষ। মেঘনাদ বা রবীন্দ্রনাথ কেহই কারিগর নহেন। তাই বলিয়া একজন নিপুণ তঁতী বা মুচীর স্থান তাহাদের উর্দ্ধে হইবে।”

আমার উত্তর—একজন মূখ পুরোহিত যে সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ না জানিয়াই শ্রাদ্ধ বা বিবাহের মন্ত্র পড়ায়, তাহার সামাজিক সম্মান তঁতী বা মুচীর অধিক হইবে কেন? তাঁতী বা মুচী পরিশ্রম দিয়া সমাজের একটা বিশেষ কাজ করে, কিন্তু মূর্খ পুরপহিতকে প্রতারক ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ? কসাইর 'ছেলের' যদি প্রতিভা থাকে, তাহা হইলে ইউরোপে সে Shakespeare হইতে পারিত, কিন্তু এদেশে প্রাচীন প্রথা অনুসারে সে "রবীন্দ্রনাথ" বা "কালিদাস হইতে পারিত না, হইবার চেষ্টা করিলে ভগবানের অবতার রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তাহার মাথা কাটিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা করিতেন। Bata বা Lloyd Georgeএর মত মুচী বা মুচীর ছেলে প্রতিভা দেখাইলে সমাজে কেন শ্রেষ্ঠস্থান পাইবে না?

"অবতারবাদ ও ক্রমবিবর্তনবাদ"

হিন্দু অবতারবাদ (Theory of Incarnation) এবং বর্তমান বৈজ্ঞানিক ক্রমবিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) এই উভয়ের সামঞ্জস্য করিতে যাইয়া সমালোচক আশ্চর্য রকমের গবেষণা শক্তির পরিচয় দিয়াছেন এবং মাঝে মাঝে জন্মান্তরবাদের (Theory of Transmigration of Soul) সহিত উভয়কেই গুলাইয়া ফেলিয়াছেন।

"আশী লক্ষ যোনি ভ্রমণ করে পেয়েছে মানব জীবন রে।"

এ কথা নিছক জন্মান্তরবাদ এবং ইহার স্থূল মম এই যে, কোন মানুষ পাপ করিলে তাহার নীচ যোনিতে জন্ম হয় এবং বহুলক্ষবার নীচ যোনিতে ভ্রমণ করিয়া পাপের অবসান হইলে সেই আত্মা পুনরায় মানুষ দেহে জন্মগ্রহণ করে এবং মুক্তিলাভের সুযোগ পায় ।

ইহার সহিত পাশ্চাত্য Theory of Evolution এর সামঞ্জস্য সমালোচকের নিজস্ব আবিষ্কার ; কারণ পরলোকগত শশধর তর্কচূড়ামণি, যিনি হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন, অগস্ত্যের সমুদ্রশোষণ কাহিনীকে Electrolysis বলিয়াছিলেন, তিনিও এতবড় আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই।

আশ্চর্যের বিষয় এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের অব্যবহিত পরেই সমালোচক এক লম্ফে অবতারবাদে পৌঁছিয়াছেন। তাহার মতে হিন্দু অবতারবাদে পাশ্চাত্য Theory of Evolutionর মূলতত্ব নিহিত আছে। সমালোচকের মত গ্রহণ করিলে বেচারা Darwin নেহাৎ ভাবচৌর বই নন।

কিন্তু নিরপেক্ষ পাঠক একটু পড়িলেই দেখিবেন যে, সমালোচকের Theory of Evolutionএর জ্ঞান প্রায় নাই বলিলেই হয় ; ইহা মার্জনীয়, কারণ তিনি পাশ্চাত্যবিজ্ঞানের সহিত সম্ভবতঃ অপরিচিত। কিন্তু আমি দেখাইতেছি যে অবতারবাদ সম্বন্ধেও তাহার জ্ঞান ভ্রান্তিপূর্ণ।

"জন্মান্তরবাদে যাহার বিশ্বাস করিবার ইচ্ছা আছে, তিনি করিতে পারেন, আমি নিজে ইহাতে মোটেই বিশ্বাস করি না। কারণ জন্মান্তরবাদের কোনও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ (প্রত্যক্ষ বা আনুমানিক) আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার বিশ্বাস যে প্রাচীন ভারতে একশ্রেণীর নীতিকারগণ সাধারণ লোককে সৎপথে রাখার জন্য যেরূপ স্বর্গ নরক প্রভৃতি কাল্পনিক, জগতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তেমনি অন্য শ্রেণীর নীতিকারগণ (প্রধানতঃ বৌদ্ধগণ) জন্মান্তরবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন।

কিন্তু ক্রমবিবর্তনবাদ (Theory of Evolution) সুপরিদৃষ্ট আবিষ্কার ও সুপরীক্ষিত মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার পশ্চাতে বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক সংগৃহীত পৃথিবীর অতীত যুগের সহস্র সহ প্রাণীদেহাবশেষের আবিষ্কার রহিয়াছে। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে এই সমস্ত আবিষ্কারকে শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে, বাদ ও বিচার দ্বারা তাহাদের পৌর্বাপর্য প্রমাণিত করা হইয়াছে এবং প্রাকৃতিক

বিজ্ঞানের সুপরীক্ষিত নিয়ম দ্বারা প্রত্যেক জীবযুগের সময় নির্ধারিত হইয়াছে-Darwinএর সিদ্ধান্তে যে সমস্ত ক্রুটি বা অপূর্ণতা ছিল, Mendelismএর সাথে যে সমস্ত অসামঞ্জস্য ছিল, তাহাও অনেকটা সমাধান হইয়া আসিয়াছে। এই তত্ত্বের সহিত জন্মান্তরবাদের সাদৃশ্য নেহাৎ কল্পনালোক প্রবাসী ব্যতীত কেহ ধারণাও করিতে পারেন না।

অবতারবাদের মূলসূত্র সম্বন্ধে গীতায় কৃষ্ণের মুখ দিয়া বলান হইয়াছে—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্। ধর্মসংস্থাপনার্থায় চ সম্ভবামি যুগে যুগে।

অর্থাৎ ভগবান্ নিজে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য এবং দুষ্টদের বিনাশের জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করেন।

ইহার সহিত পাশ্চাত্য ক্রমবিবর্তনবাদের সম্বন্ধ আছে: এ নেহাৎ গায়ের জোর ছাড়া একথা কেহ বলিতে পারেন - না। উক্ত মতে অতি প্রাচীন যুগে প্রায় ৫০০ কোটি বৎসর পূর্বে খুব নিম্নস্তরের জীব পৃথিবীতে আবির্ভূত হয় । তৎপরে পর পর মৎস্য, সরীসৃপ, পক্ষী, স্তন্যপায়ী জন্তু এবং সর্বশেষ

বানর ও মানুষের ক্রমবিবর্তন হয়। ইহার মধ্যে ভগবানের কোন কথাই নাই ; সমালোচক ক্রমবিবর্তন সম্বন্ধে কি পুস্তক পড়িয়াছেন জানি না; কিন্তু কোন্ পাশ্চাত্য পুস্তকে লিখিত আছে যে এককালে এই পৃথিবীতে অর্ধ-মানব অর্ধ-সিংহ জানোয়ারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ?

কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন যে এককালে মানুষ বামন অর্থাৎ অতি হ্রস্বাকার ছিল। প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে মানুষ Pleistocene যুগে নরাকৃতি বানর হইতে মস্তিষ্ক এবং অন্যান্য অঙ্গের ক্রমোৎকর্ষবশতঃ বর্তমান মানুষে (Homo Sapiensএ) পরিবর্তিত হইয়াছে। এই বিবর্তনের স্তরে স্তরে অনেক রকম মানবের অস্তিত্ব আবিস্কৃত হইয়াছে, যেমন Picking Man, Java Man, Neanderthal man, Cro-magnon Man ইত্যাদি, কিন্তু তাহারা কেহই আকারে বামন ছিল না। তাহার পর ক্রমবিবর্তনবাদের সহিত সভ্যতার আধ্যাত্মিক বিকাশের একীকরণ করিতে যাইয়া সমালোচক নানা রকম অবান্তর প্রলাপের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি মানবসমাজের সভ্যতার ইতিহাসও জানেন না এবং হিন্দুর অবতারবাদও সম্যক অবগত নহেন। তিনি লিখিয়াছেন, “একযুগে মানুষ সভ্যতার উন্নতি করে, সেইটেই সত্যযুগ। ক্রমশঃ তাহার অবনতি হয় তাহাকে কলিযুগ বলা হয়।”

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি যে তিনি প্রাচীন মিশর এবং প্রাচীন ব্যাবিলন—এই দুই দেশ—যাহাদের সম্বন্ধে প্রায় ছয় হাজার বৎসরের পুরাতন ইতিহাস বর্তমান গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে কোন পুস্তক পড়িয়াছেন কি? এই দুই দেশের অথবা প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে সমালোচক অনিলবরণ বর্ণিত বা হিন্দুপুরাণ কথিত পর্য্যায়ক্রমে আগত সত্য, বা কলিযুগের কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। প্রত্যেক সভ্যতার ইতিহাসে চিরকাল মানুষে মানুষে সংঘর্ষ, যুদ্ধবিগ্রহ, মহামারী ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি লাগিয়াই আছে। হয়ত অতি অল্পকালের জন্য Ramses (Egypt), Hammurabi (Babylonian), Augustus (Roman), Asoke (Hindu Buddhist) বা Akbar (Indian Moslem) ন্যায় পরাক্রান্ত রাষ্ট্রপতিগণ দেশে সম্পূর্ণ শান্তি ও শৃঙ্খলা আনিতে সমর্থ হন, কিন্তু এই সময়ের পরিমাণ ৫০ বা ৬০ বৎসরের বেশী নয় এবং ইহাকে কোনমতে

হিন্দুপুরাণকথিত সত্যযুগ বলা যাইতে পারে না। সত্যযুগ এবং যুগবিবর্তন প্রাচীন হিন্দু পুরাণকারের কল্পনাপ্রসূত জিনিষ। প্রামাণ্য ইতিহাস গ্রন্থ যেমন H. G. Wellsএর Universal listory of the World ইত্যাদি অধ্যয়ন করিলে লেখক দেখিতে পাইবেন যে বাস্তব মানব-ইতিহাসে যুগবিবর্তনবাদের কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। লেখক

হিন্দু অবতারবাদের গোড়ার কথার সম্বন্ধে শুধু অজ্ঞতার পরিচয় দেন নাই, বিশেষ বিশেষ অবতার সম্বন্ধে অদ্ভুত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

অবতারবাদ সম্বন্ধে সমস্ত হিন্দুশাস্ত্র একরূপ মত প্রকাশ করে নাই। মহাভারত (শান্তিপর্ব, ২৪০ অধ্যায়) মতে বুদ্ধ মোটে অবতার নন। তাহাতে অবতারের লিষ্ট দেওয়া হইয়াছে—হংস, কূর্ম, মৎস্য, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ ও কল্কী। এখানে বুদ্ধের নাম নাই। “হংসটা কি কাজ করিয়াছিলেন, তাহার কোথাও উল্লেখ নাই। শুধু মহাভারতে নয়, বিষ্ণুপুরাণেও বুদ্ধকে প্রকারান্তরে মায়ানমাহের অবতার বলা হইয়াছে। অধিকাংশ বৈষ্ণব পুরাণমতে কৃষ্ণ অবতার নহেন, একেবারে পরমব্রহ্ম-বলরাম অবতার। অধিকাংশ পুরাণমতে গুপ্ত রাজাদের পরেই কল্কী অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন অর্থাৎ কল্কি অবতার বৌদ্ধ প্রাধান্যের অবনতি ও পৌরাণিক হিন্দুধর্মের উত্থানের দ্যোতক মাত্র। রামায়ণ পাশবিকতা ও মানবিকতার মধ্যে যুদ্ধের একটা রূপক, এই অদ্ভুত তত্ত্বব্যাখ্যা শুনিয়া সমঝদার লোক সকলেই নিশ্চয় অবিশ্বাসের হাসি হাসিবেন। যে কোন যুদ্ধকেই পাশবিকতা ও মানবিকতার দ্বন্দ্ব বলা যাইতে পারে।

মোটের উপর সমালোচক অবতারবাদ বা জন্মান্তরবাদ কোন বাদেরই মূলতত্ত্বের কথা অবগত নন এবং পাশ্চাত্য ক্রমবিবর্তনবাদ সম্বন্ধে তাহার বিরাট অজ্ঞতা রহিয়াছে। তিনি প্রাচীন হিন্দুদর্শন ও পুরাণে বর্তমান বিজ্ঞানের মুলতত্ত্ব খুজিতে যাইয়া কতকগুলি অসঙ্গত প্রলাপ বকিয়াছেন মাত্র।

(২)

"বিজ্ঞান ও চৈতন্য"

সমালোচক অনিলবরণের মতে "বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকেরা নাকি বলিয়াছেন যে বিশ্বজগতের পশ্চাতে একটা বিরাট চৈতন্য আছে; যদিও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা এই চৈতন্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসবান হন নাই।" যেহেতু ডাক্তার মেঘনাদ বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্য স্বীকার করেন নাই (যদিও কোথায় অস্বীকার করিয়াছি তাহা সমালোচক কোথাও দেখান নাই) সুতরাং তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক। এই সম্বন্ধে তিনি Napoleon ও Laplace সম্বন্ধীয় একটি গল্পের উল্লেখ করিয়াছেন।

সমালোচক কোথাও চৈতন্যে বিশ্বাসবান বৈজ্ঞানিকদের নামধাম বা তৎপ্রণীত পুস্তকাদির উল্লেখ করেন নাই।

সুতরাং তাহার সহিত বিচার, অনেকটা হাওয়ার সাথে লড়াই। তিনি Napoleon-Laplace সম্বন্ধীয় গল্পটি ইংরেজি তর্জমায় পড়িয়াছেন, কাজেই পরের মুখে ঝাল খাইলে যা হয়, গল্পের প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়া তাহার অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। আসল গল্পটি এই- Laplace তাহার সুবিখ্যাত Mecanique Celeste গ্রন্থে গ্রহসমূহের এবং চন্দ্রের গতির সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা করেন এবং প্রমাণ করেন যে গতিতত্ত্ব (Dynamics) ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়া পর্যবেক্ষিত সমস্ত গ্রহগতির সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা হয়। তিনি যখন এই গ্রন্থ Napolean কে উৎসর্গ করিবার অনুমতি প্রার্থী হন তখন Napolean রহস্য করিয়া বলেন Mons. Laplace , you have so well described and explained the mechanics of the heavenly bodies, but I find that you have nowhere mentioned the creator. Laplace উত্তর দেন—“ Monsceigneur, je n’avais pas besoin de tel hypthese” “Sire, I had not the necessity of such a hypothesis.”

Laplace র এই মন্তব্য সম্বন্ধে নানারূপ ভুল ধারণা হইয়াছে। যদি পূর্বের context না জানা থাকে তাহা হইলে মনে হইবে যে Laplace ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মন্তব্যটিকে তাহার context এর সহিত

ধরিতে হইবে! Laplace এর সময় তর্ক উঠিয়াছিল যে গ্রহউপগ্রহাদির গতি ব্যাখ্যার জন্য গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যথেষ্ট কিনা! বাস্তবিক পক্ষে তাৎকালিক পর্যবেক্ষণের ফলে গ্রহউপগ্রহাদির গতি এত জটিল প্রতীয়মান হইয়াছিল যে অনেক পণ্ডিত মনে করিতেন যে গতিতত্ত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ দ্বারা স্থূলভাবে গ্রহাদির পথের ব্যাখ্যা মিলে, বাস্তবিক সূক্ষ্মভাবে ব্যাখ্যা সম্ভবপর নয়।অনেকে মনে করিতেন যে মধ্যে মধ্যে কোনো অদৃশ্য হস্তের প্রভাবে (unseen agency) গ্রহগতির সামঞ্জস্য সাধিত হয়। কিন্তু Laplace প্রমাণ করিলেন যে মাধ্যাকর্ষণ ও গতিতত্ত্বই যথেষ্ট, কোনও অদৃশ্য শক্তির অস্তিত্ব কল্পনার প্রয়োজন নাই। তাই তিনি Napolean কে উক্তরূপ জবাব দিয়াছিলেন। ইহা হইতে তিনি "ঈশ্বর আছেন বা না আছেন তৎসম্বন্ধে কোন স্পষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছিলেন এইরূপ ধরিয়া লওয়া অত্যন্ত অসঙ্গত হইবে। বাস্তবিকই প্রকৃত বৈজ্ঞানিকেরা যে বিষয় লইয়া গবেষণা করেন, তাহার বাহিরে কোন বিষয়ে তাহারা যদি কিছু বলেন, তাহাকে যুক্তি ও তর্কের পরীক্ষা দ্বারা যাচাই করিয়া লইতে হইবে। Sir J. J. Thompson বলিয়াছেন যে যদি কোন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক ধর্ম সম্বন্ধে কোন বিশেষ মত প্রকাশ করেন, সেই মত তাহার পরিবার বা সমাজপ্রদত্ত শিক্ষা হইতে সজ্ঞাত মনে করিতে হইবে; তাহার এই মত যদি বিজ্ঞানসজ্ঞত প্রমাণপ্রয়োগসহ উপস্থাপিত না হয়, তাহা হইলে নেহাৎ ব্যক্তিগত মত বলিয়াই গণ্য করা হইবে। অর্থাৎ এই মতের উপর উক্ত

বৈজ্ঞানিকের ব্যক্তিত্বের গুরুত্ব চাপানো অন্যায় হইবে। কাজেই কোনও বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যদি ঈশ্বরবাদে বিশ্বাসবান হন এবং তজ্জন্য তিনি যদি নিছক বিশ্বাস ব্যতিত বিজ্ঞানের স্বীকৃত প্রমানাদি উপস্থিত না করেন, তাহা হইলে সেই মতের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করা অসঙ্গত হইবে।

সুতরাং বিংশ শতাব্দীর কোন বৈজ্ঞানিক বিশ্বজগতের পশ্চাতে বিরাট চৈতন্য আছে এবং কি প্রমাণে তিনি এইরূপ বলিয়াছেন, তাহার সবিশদ বর্ণনা না পাইলে সমালোচকের অবান্তর বাগাড়ম্বরের প্রতিবাদ করিতে যাওয়া নিরর্থক। সমালোচকের লেখা দৃষ্টে মনে হয় যে তিনি একজন God-drunk লোক এবং বোধহয় ঈশ্বরকে উপলব্ধি করারও দাবী করেন। আমার সেরূপ সৌভাগ্য হয় নাই, হইলে সুখী হইব।

আমাদের বক্তৃতার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল যে "God is a subjective creation of the human mind" অর্থাৎ প্রত্যেক যুগে এবং প্রত্যেক দেশেই লোকে নিজেদের মন হইতে "ঈশ্বরের স্বরূপ" কল্পনা করিয়া নেয়। সুতরাং এইসব "মনগড়া ঈশ্বরের" প্রকৃতি বিভিন্ন হয় এবং ঈশ্বরের ধারণা সেই জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের মনোভাব মাত্র ব্যক্ত করে। ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রমাণসঙ্গত কোনো Objective

ধারণা এ পর্যন্ত কেহ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া , আমার জানা নাই। "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাত্", সাংখ্যকারের এই উক্তি বোধহয় একালেও চলে।

সমালোচক মনে করেন যে ভগবান অচলা ভক্তি ব্যাতীত ধর্ম হইতে পারে না। তিনি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। এই সমস্ত ধর্মে ভগবানের বা সৃষ্টিকর্তার স্থান কোথায়? অথচ বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম আড়াই হাজার বৎসর ধরিয়া মানবজাতির একটা প্রকাণ্ড অংশের মনোবৃত্তি, রীতিনীতি, সমাজ সংগঠনের মূলভিত্তি গঠন করিয়াছে। এখনও চীন ও জাপান দেশে বৌদ্ধমতের প্রাধাণ্য অক্ষুণ্ণ। ভারতে অবশ্য পৌরাণিক হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে অভিভূত করিয়াছে; কিন্তু অনেকের মতেই তাহাই ভারতের অধঃপতনের মূল কারণ। বর্তমানে রুশিয়া দেশ সম্পূর্ণ Godless এবং তাহারা গত ২০ বৎসরের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়শীল হইয়া যেরূপে দেশের সর্ববিধ বস্তুতান্ত্রিক উন্নতিসাধন করিয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। সুতরাং ভগবানের দোহাই ছাড়া ধর্ম বা সভ্যতা গড়িয়া উঠিতে পারে না, পৃথিবীতে সভ্যতার বিকাশ সম্বন্ধে পর্যালোচনা করিলে এই মত সমর্থন করা চলে না।

"প্রাচীনেরা ভাবিতেন যে পৃথিবী বিশ্বের কেন্দ্র... নিয়ন্ত্রিত করেন"

আমার বক্তৃতার উক্ত অংশের সমালোচনায় সমালোচক অনর্থক বাগজাল বিস্তৃত করিয়া হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমি অনভিজ্ঞ এবং হিন্দু জ্যোতিষে বর্তমান পাশ্চাত্য জ্যোতিষের সমস্ত তত্ত্বই নিহিত আছে এই কথা বলিতে চাহিয়াছেন। এই ধারণা কত ভ্রমাত্মক তাহা দেখাইতেছি।

"প্রাচীনেরা মনে করিতেন যে পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্র" – আমার এই মন্তব্যের সমালোচক অপব্যাখ্যা করিয়াছেন। Context এর সহিত মিলাইয়া দেখিলে তিনি বুঝিতে পারিবেন যে পৃথিবী যে বিশ্বজগতের জ্যামিতিক কেন্দ্র তাহা আমি কোথাও বলি নাই। বলবার উদ্দেশ্য যে প্রাচীনকালে এই ধারণা ছিল- " এই পৃথিবীই বিশ্বজগতে শ্রেষ্ঠ জিনিস"। সূর্য, চন্দ্র, তারকা পৃথিবীস্থ জীবের বিশেষতঃ মানুষের কোথাও বিশেষ প্রয়োজনবশতঃই ঈশ্বরনির্দিষ্ট হইয়া স্পষ্ট হইয়াছে এই ধারণা অনেক ধর্মেই বলবতী ছিল।

"তারকাগুলি ধার্মিক লোকের আত্মা"

প্রাচীনকালের সমস্ত দেশেই এই ধারণা ছিল, এমন কি এই বেদপ্রবুদ্ধ দেশেও। গ্রীস দেশের সমস্ত পৌরাণিক কাহিনী মোটের উপর এই বিশ্বাস-প্রণোদিত। তারকাগুলির নামেও ইহার পরিচয়। মহাভারতেও এই বিশ্বাসের পরিচয় আছে। যথা বনপর্বে (৪২ অধ্যায়ে) অর্জুন যখন অস্ত্রলাভার্থ মাতলির সহিত স্বর্গে প্রয়াণ করিতেছেন, তখন তাহার প্রশ্নের উত্তরে মাতলি বলিতেছেনঃ-

হে পার্থ! তুমি ভূমণ্ডল হইতে এই সমস্ত তারকা পর্যবেক্ষণ করিয়াছ। পুণ্যশীলেরা সুকৃতি ফলে তারকারূপে স্ব স্ব স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন।

সুতরাং উপরিউক্ত মন্তব্যে আমি কোন মনগড়া কথা বলি নাই বা হিন্দুশাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যা করি নাই। বর্তমান জ্যোতিষশাস্ত্র অনুসারে তারকাগুলি এক একটি সূর্যমণ্ডল এবং বর্তমান লেখকের গবেষণায় (Saha's Theory of Ionisation) তাহাদের রাসায়নিক উপাদান, তাপমান, প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব উদঘাটিত হইয়াছে। মোটের উপর সূর্য হইতে তাহাদের বিভিন্নতা কেবল তাপক্রম, ওজন ও পরিমাণজনিত। বর্তমান বিজ্ঞানের এই সমস্ত আবিষ্কার সত্য ধরিয়া লইলে পৌরাণিক ধ্রুব উপাখ্যানে (বিষ্ণু ও ভাগবত পুরাণ), অগস্ত্যোপাখ্যান, প্রজাপতির কন্যাসক্তি, দক্ষযজ্ঞ- এক

কথায় সমস্ত Pauranic Mythologyর ভিত্তি ভূমিসাৎ হয় এই আমার বক্তব্যের সারমর্ম।

সমালোচক বলিয়াছেনঃ-

"গ্রহগণ মানুষের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ করে- এ কথা কি শুধু প্রাচীন দর্শনের কথা? আধুনিক বৈজ্ঞানিক ইউরোপে কি কেহ এ কথা বিশ্বাস করে না?"

আমি কোথাও দর্শনের কথা বলি নাই, লোক প্রচলিত মতের কথাই বলিয়াছি। সম্ভবতঃ সমালোচক অস্বীকার করিবেন না যে আমাদের দেশে এখনও শতকরা ৯৯ জন লোক পঞ্জিকা ও ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাসবান। ইউরোপে কেহ কেহ বিশ্বাস করে- কিন্তু তাহাদের অনুপাত কত? সম্প্রতি Penguine Series এ প্রকাশিত পুস্তকে উক্ত হইয়াছে যে ইংলণ্ডে পুরুষদের মধ্যে শতকরা ৫ জন ফলিত জ্যোতিষে পূর্ণ আস্থাবান, ১৫ জন আংশিক এবং ৮০ জন মোটেই বিশ্বাস করে না। স্ত্রীলোকের মধ্যে শতকরা ৩৩ জন পূর্ণ বিশ্বাস করে, ৩৩ জন আংশিক বিশ্বাস করে এবং ৩৩ জন মোটেই বিশ্বাস করে না। এইসমস্ত তথ্য বহু গবেষণার ফলে সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে শতকরা ৯৯ জন পুরুষ এবং ১০০ জন স্ত্রীলোক ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। এখনও তথাকথিত শুভদিন না হইলে, কোষ্ঠী না মিলিলে বিবাহ হয় না! পঞ্জিকা কথিত

শুভদিন না দেখিয়া অধিকাংশ লোকের বিদেশ যাত্রা হয় না। হাঁচি, টিকটিকি ও পাঁজি সমস্ত হিন্দুজীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। বিলাতের দু চারজন দুর্বল মস্তিষ্ক লোকে ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করে, এই তর্কে আমাদের সর্বজনব্যাপী কুসংস্কারের ন্যায্যতা ও উপকারীতা প্রমাণিত হয় না। আমার বিশ্বাস যে হাঁচি, টিকটিকি ও পঞ্জিকায় অন্ধবিশ্বাস জাতীয় জীবনের দৌর্বল্যের দ্যোতক। এতদ্দেশে প্রচলিত পঞ্জিকা যে ভুল গণনা দ্বারা পরিচালিত এবং অর্ধসত্যাত্মক কুসংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত ইহা মৎ সম্পাদিত Science and Culture পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধে তাহা দেখান হইবে।

Hindu Astronomy সম্বন্ধে আমি কোন মন্তব্যই প্রকাশ করি নাই, অথচ সমালোচক অযাচিত মন্তব্য করিয়াছেন, "ডক্টর মেঘনাদ সাহা এখানে Astronomy ও Astrology এই দুই এর মধ্যে গোলমাল করিয়াছেন।"কোথায় গোলমাল করিয়াছি এবং কোথায় আমি Astronomy র উপর মন্তব্য করিয়াছি, তিনি দেখাইয়া দিলে বাধিত হইব।

লেখক হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমাকে অনেক জ্ঞান দান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তিনি বোধ হয় মোটেই জ্ঞাত নন যে আমি হিন্দু জ্যোতিষ (Astronomy) আজীবন অধ্যয়ণ করিয়াছি এবং ভারতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের

ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে আমার কিছু ধারণা আছে। সুতরাং সমালোচকের হিন্দু জ্যোতিষ সম্বন্ধে ধারণা যে প্রায়শঃ অমূলক ও বিরাট অজ্ঞতা প্রসূত তাহা দেখাইতে প্রয়াসী হইলাম।

সমালোচক অনিলবরণ ও হিন্দু জ্যোতিষ

সমালোচক ভারত বর্ষের লোকদিগকে জানাইয়াছেন যে এই দেশে সূর্য যে সৌরজগতের কেন্দ্র এই মত জানা ছিল এবং গ্যালিলিওর বহুপূর্বেও ভারতবর্ষে জানা ছিল যে পৃথিবী সচল হইলেও স্থির বলিয়া মনে হয়। সুতরাং ইউরোপীয় বিজ্ঞান নূতন কিছুই করে নাই ইত্যাদি।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের তুলনামূলক আলোচনা করিতে হইলে প্রথম দরকার কালজ্ঞান। কোনও বিশেষ আবিষ্কার কোন কালে বা কোন জাতি প্রথম করিয়াছে, এই তর্ক উঠিলে প্রথম দেখিতে হয় যে কোন সময়ে উক্ত লোক বা জাতি এই বিশেষ আবিষ্কার দাবী করিয়াছে এবং তাহা কতটা প্রমাণসহ। সমালোচক অনিলবরণ কালের পৌর্বাপর্য কিছুমাত্র বিচার করেন নাই। এই বিষয়ে তাহার কতটা অধিকার আছে জানি না। যদি অধিকার না থাকে, এই সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাওয়া তাহার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ। সুতরাং তাহার অবগতির জন্য ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করিতে হইবে।

জ্যোতিষশাস্ত্রের বিশেষ সুবিধা এই যে ইহাতে মিথ্যা বা মনগড়া কল্পনার স্থান নাই। কারণ জ্যোতিষে গ্রহনক্ষত্র বা কালগণনা সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনার উল্লেখ করিতে হয়, সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই ঐ সমস্ত ঘটনার সময় নিরূপন করা যায়। সুখের বিষয় ভারতীয় জ্যোতিষের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্যতীত ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে পরলোকগত মহারাষ্ট্র-পণ্ডিত শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিত, মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। সমালোচক 'দেব ভাষায়' , ভারতীয় ভাষায় এবং ইংরেজি ভাষায় রচিত এই লেখকদেরর গ্রন্থ পাঠ করিলে ভারতীয় জ্যোতিষ (Astronomy) সম্বন্ধে তাহার ধারণা কত ভ্রান্ত বুঝিতে পারিবেন। বর্তমান লেখক এই সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন এবং এই সম্বন্ধে সমস্ত মৌলিক পুস্তকের জ্ঞান আছে বলিয়া দাবী করেন।

এই সমস্ত পণ্ডিতগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে ভারতীয় জ্যোতিষের ক্রমবিকাশের তিনটি স্তর আছে-

১) বেদকাল (খ্রিস্ট পূর্ব ১৪০০ শতাব্দীর পূর্ববর্তী)

২) বেদাঙ্গ জ্যোতিষকাল (খ্রিস্ট পূর্ব ১৪০০ শতাব্দী হইতে ৪০০ খ্রিস্ট অব্দ)

৩) সিদ্ধান্ত কাল (৪০০ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ)

বেদকালের জ্যোতিষ অতি সাধারণ রকমের এবং বহু স্থলেই অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈত আছে। তদপেক্ষা উন্নততর বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালগণনা প্রণালী ‘মহাভারতে’ অনুসৃত হইয়াছে (বিরাট পর্ব, ৫২ অধ্যায়) ।মহাভারতের সংকলনকাল দীক্ষিতের মতে (এবং যাহা এখন সর্বাদিসম্মত) ৪৫০ খ্রিস্ট পূর্ব হইতে ৪০০ খ্রিস্ট অব্দ। সমালোচক যদি প্রমাণ চাহেন তাহা দেওয়া যাইবে। এই ‘মহাভারতে’ কুত্রাপি সপ্তাহ, বার, রাশিচক্রের (যাহা বর্তমান পঞ্জিকার একটি প্রধান অঙ্গ) উল্লেখ নাই। মহাভারতে কোথাও পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্তনবাদ বা সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণবাদের উল্লেখ নাই; বরঞ্চ যে সমস্ত মতের উল্লেখ আছে তাহা উক্ত সমস্ত মতবাদ হইতে সম্পূর্ণ অন্যরকমের (ভীষ্মপর্ব, ৬ অধ্যায়) (বন পর্ব, ১৬২ অধ্যায়)। মহাভারতে পৃথিবীকে সমতল বর্ণনা করা হইয়াছে, সুমেরু উহার কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এবং পৃথিবী যতটা প্রসারিত, সুমেরু প্রায় ততটা উঁচু এবং সূর্য সুমেরুর চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া দিবারাত্র ঘটায়, এইরূপ বর্ণিত আছে। সুতরাং ধরা যাইতে পারে যে মহাভারত সংকলনকালের অর্থাৎ ৪৫০ খ্রিস্ট পূর্ব অব্দের পূর্বে ভারতে পৃথিবীর গোলত্ব বা

আবর্তনবাদ, অথবা সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণবাদ জানা ছিল না।

বেদাঙ্গ জ্যোতিষের কালগণনা প্রণালী বর্তমান সময়ের তুলনায় অত্যন্ত স্থূল ও অশুদ্ধ। এই গণনাপ্রণালীই একটু পরিবর্তিত হইয়া খ্রিষ্টের কিছু পর পর্যন্ত “পৈতামহ সিদ্ধান্ত” নামে প্রচলিত ছিল এবং ইহাই পরবর্তীকালে “পিতামহ ব্রহ্মা” প্রণীত বলিয়া স্বীকৃত হয়। অন্যান্য সিদ্ধান্তের তুলনায় এই প্রাচীন সিদ্ধান্ত কতদূর অশুদ্ধ, ৫৫০ খ্রিস্টাব্দের প্রসিদ্ধ জ্যোতিষী বরাহমিহিত লিখিত নিম্নলিখিত শ্লোক হইতে তাহার ঠিক ধারণা হইবে।বরাহ মিহির তাহার সময়ে প্রচলিত পাঁচ খানা সিদ্ধান্তের সারমর্ম তাহার পঞ্চ-সিদ্ধান্তিকা নামক করণ গ্রন্থে বর্ণনা করেন এবং উক্ত পঞ্চসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তুলনামূলক মন্তব্য করেন।

“ পৌলিশ রোমক বাশিষ্ঠাসৌরপৈতামহাস্ত সিধান্তাঃ।

পঞ্চভ্যোঃ দ্যাবাদ্যৌ ব্যাখ্যাতৌ লাটদেবেন।

পৌলিশকৃতঃ স্ফুটোহসৌ তস্যাসন্নস্ত রোমকপ্রোক্তঃ ।

স্পষ্টতরঃ সাবিত্রঃ পরিশেষৌ দূরবিভ্রষ্টৌ ।“

এই শ্লোকের অর্থ যে বরাহ মিহিরের সময়ে (৫৫০ খ্রিস্টাব্দে) পাঁচখানা সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল – পৌলিশ বা

পুলিশ , রোমক, সৌর, বাশিষ্ঠ ও পৈতামহ। তন্মধ্যে প্রথম দুইখানি লাটদেব ব্যাখ্যা করেন; এই দুই খানির মধ্যে পৌলিশ সিদ্ধান্ত স্ফুট অর্থাৎ শুদ্ধ , রোমক সিদ্ধান্ত তাহার আসন্ন অর্থাৎ তদপেক্ষা অশুদ্ধ; সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ সূর্য-সিদ্ধান্ত , কিন্তু অবশিষ্ট দুইখানি , বাশিষ্ঠ ও পৈতামহ সিদ্ধান্ত 'দূরবিভ্রষ্ট' অর্থাৎ অত্যন্ত অশুদ্ধ।

এই মন্তব্যটি তলাইয়া বুঝিতে হইবে। নাম দৃষ্টে প্রমাণ যে রোমক ও পৌলিশ-সিদ্ধান্ত বিদেশ হইতে আনুমানিক ৪০০ খ্রিস্ট অব্দে ভারতবর্ষে আনীত হয়। ইহার প্রমাণ চাহিলে দেওয়া যাইবে। বাস্তবিকপক্ষে পৌলিশ সিদ্ধান্ত Paulus of Alexandria (376 A.D) র জ্যোতিষ গ্রন্থ হইতে সংকলিত। বাকি রহিল সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ সূর্য সিদ্ধান্ত কিন্তু ইহাও যে বিদেশ হইতে ধার করা তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে আধুনিক সূর্য সিদ্ধান্তের প্রারম্ভে বলা হইয়াছে-

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে ।

সমস্ত জগদাধারমূর্ত্তয়ে ব্রাহ্মণে নমঃ।। ১

অল্পাবশিষ্ট তু কৃতে ময়নামা মহাসুরঃ।

রহস্যং পরমং পুণ্যং জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানমুক্তমং।। ২

বেদাঙ্গমগ্র্যমখিলং জ্যোতিষাং গতিকারণাং।

আরাধয়ন্ বিবস্বন্তং তপস্তেপে সুদুশ্চরং।। ৩

তোষিতস্তপসা তেন প্রীতস্তস্মৈ বরার্থিনে।

গ্রহাণং চরিতং প্রাদান্ময়ায় সবিতা স্বয়ম্।। ৪

শ্রীসূর্য্য উবাচ

বিদিতস্তে ময়া ভাবস্তোষিতস্তপসা হ্যহম।

দদ্যাং কালাশ্রয়ং জ্ঞানং গ্রহাণং চরিতং মহৎ।। ৫

ন মে তেজঃ সহঃ কশ্চিদাখ্যাতুং নাস্তি মে ক্ষণঃ।

মদংশঃ পুরুষোহয়ং তে নিঃশেষং কথয়িষ্যতি।। ৬

ইত্যুক্তান্তর্দধে দেবঃ সমাদিশ্যাংশমাত্মনঃ।

স পুমান্ ময়মাহেদং প্রণতং প্রাঞ্জলিস্থিতম্।। ৭

শৃণুষ্বৈকমনাঃ পূর্ব্বং যদুক্তং জ্ঞানমুত্তমং।

যুগে যুগে মহর্ষীণাং স্বয়মেব বিবস্বতা।।৮

-সত্যযুগের কিঞ্চিত অবশিষ্ট থাকিতে , ময় নামক মহাশুর পরমপূণ্যপদ, রহস্য, বেদাঙ্গশ্রেষ্ঠ , সমস্ত গ্রহদিগের গতি

কারণরূপ উত্তর জ্ঞানলাভে জিজ্ঞাসু হইয়া দুশ্চর তপস্যা দ্বারা সূর্যদেবের আরাধনা করিয়াছিলেন। ২-৩

শ্রীসূর্যদেব বরার্থী ময়াসুরের তপস্যায় পরমপ্রীত হইয়া তাহাকে গ্রহজ্ঞানবিষয়ক জ্যোতিষশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য স্বয়ং অধিষ্ঠিত হইলেন। ৪

সূর্য বলিলেন, হে ময়! আমি তোমার মনোগত ভাব অবগত হইয়াছি এবং তোমার তপ দ্বারাও তুষ্ট হইয়াছি; অতএব আমি তোমাকে গ্রহদিগের স্থিতিচলনাদি প্রতিপাদক জ্যোতিষ শাস্ত্র উপদেশ করিতেছি; কিন্তু কেহই আমার তেজ সহ্য করিতে পারে না এবং আমারও ক্ষণকাল প্রতিক্ষা করিবার অবকাশ নাই যে তৎসমস্ত তোমার নিকট প্রকাশ করিব; অতএব আমার অংশসম্ভূত এই পুরুষ তোমার অভিপ্রেত বিষয়সকল অবগত করাইবে। ৫-৬

এই বলিয়া সূর্যদেব নিজ অংশসম্ভূত পুরুষকে ময়ের নিকট তাহার অভিপ্রেত বিষয় বর্ণনে আদেশ করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান করিলেন। সূর্যাংশের পুরুষও কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত প্রণত ময়কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ময়! সূর্যদেব যুগে যুগে মহর্ষিদিগের যে জ্যোতিষশাস্ত্র সম্বন্ধীয়

উত্তম জ্ঞান কীর্তন করিয়াছিলেন তাহা বলিতেছি, এক মন হইয়া শ্রবণ কর। ৭-৮

সূর্যসিদ্ধান্তের কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে আছে যে ময়াসুর ব্রহ্মা কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া রোমকপুরে যবনরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং তথায় সূর্যের আরাধনা করিয়া জ্যোতিষের জ্ঞান প্রাপ্ত হন এবং ময়াসুরের নিকট হইতে মহর্ষি গণ কাল ও জ্যোতিষ জ্ঞান লাভ করেন। সূর্যসিদ্ধান্তের শেষ অধ্যায়ে এইরূপভাবে পরিসমাপ্ত করা হইয়াছে-

ইত্যুক্ত্বাং ময়মামন্ত্র্য সম্যক্ তেনাভিপূজিতঃ ।

দিবমাচক্রমেহর্কাংশ প্রবিবেশ সমণ্ডলম্।।

ময়োহথ দিব্যং তজজ্ঞানং জ্ঞাত্বা সাক্ষাদ্বিবস্বতঃ।

কৃতকৃত্যামিবাত্মানং মেনে নির্ধূতকল্মষম্।।

জ্ঞাত্বা তমৃযয়শ্চাথ সূর্য্যালব্ধবরং ময়ং।

পরিব্রবুপেত্যাথো জ্ঞানং পপ্রচ্ছুরাদরাত্।।

স তেভ্যেঃ প্রদদৌ প্রীতো গ্রহাণাং চরিতং মহৎ।

অভ্যড্ভূতং লোকে রহস্যং ব্রহ্মপস্মিতম্।।

বঙ্গানুবাদ-

এইরূপ ময়কে উপদেশ করিয়া বাংময় দ্বারা পূজিত হইয়া সূর্যের অংশস্বরূপ পুরুষ সূর্যমণ্ডলে প্রবেশ করিলেন।

স্বয়ং সূর্যদেব হইতে এই জ্ঞান লাভ করিয়া ময় নিজেকে কৃতার্থ এবং নিজেকে পাপ বিনির্মুক্ত মনে করিতে লাগিলেন।

পরে ময় সূর্যদেবের নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়াছে জানিয়া ঋষিগণ তাহার নিকট আগমন করিয়া সম্মান সহকারে বিদ্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

ময় আনন্দিত হইয়া ঋষিদিগকে গ্রহাদির গুহ্য এবং আশ্চর্য ব্রহ্মবিদ্যাতুল্য মহাবিদ্যা দান করিয়াছিলেন।

(বিজ্ঞানানন্দ স্বামীকৃত সূর্য সিদ্ধান্তের অনুবাদ হইতে গৃহীত)

এই পৌরাণিক গল্পের নীহারিকার ভিতর দিয়া সত্যের অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে যে সূর্য সিদ্ধান্তে যে জ্যোতিষিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পশ্চিম দেশবাসী অসুরদিগের অর্জিত। হিন্দু পণ্ডিতগণ অসুরগণের নিকট হইতে তাহা শিক্ষা করেন। এই অসুরগণ কে?

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত সূর্যসিদ্ধান্তের ভূমিকায় বলিয়াছেন যে সূর্যসিদ্ধান্তের গণনা প্রণালী ৪০০ খ্রিস্ট অব্দ

হইতে ১০০০ খ্রিস্ট অব্দ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে পরিবর্তিত এবং স্ফূটতর (more correct) হইয়াছে। মূল সূর্য সিদ্ধান্তের সহিত Babylonian astronomy র ঐক্য আছে। সূর্য সিদ্ধান্তের প্রারম্ভিক শ্লোক তাহারই দ্যোতক মাত্র। সুতরাং সূর্য সিদ্ধান্তোক্ত জ্ঞানের উৎপত্তি কোন পশ্চিমদেশীয় নগরে, ভারতে নয়- এই জ্ঞান প্রথমে অসুরের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা করিয়া বাহির করেন এবং অসুরদিগের নিকট হইতে আর্য ঋষিরা শিক্ষা করেন। এই অসুরেরা রক্ত মাংসের লোক, প্রাচীনকালে সমস্ত পশ্চিম এশিয়া জুড়িয়া তাহারা একটা মহান সভ্যতা গঠন করেন, যাহার কেন্দ্র ছিল Babylon, Ninevah, Ur ইত্যাদি Tigris ও Euphrates নদীদ্বয়ের উপর অবস্থিত নগরগুলি।

বর্তমান কালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় প্রমাণ হইয়াছে যে প্রাচীন Babylon দেশে প্রথমে জ্যোতিষের পর্যবেক্ষণ ও গণনার সম্যক উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাহার কারণ বেবিলোনিয়গণ সূর্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রকে দেবতা বলিয়া মনে করিতেন। তাহারা মনে করিতেন যে এইসব গ্রহদেবতাগণ মানবের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে। এই ধারণার বশবর্তী হইয়া সুপ্রাচীন কাল হইতেই তাহারা গ্রহাদির গতি পর্যবেক্ষণ করিতেন। প্রায় খ্রিস্ট পূর্ব ২০০০ শতাব্দীতেও যে বেবিলোনে গ্রহনক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ হইত তাহার লিখিত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে (e.g. Venus Tables of King

Amiza Dugga nearly 19000 B.C.)। ৫৫০ খ্রিস্ট পূর্ব অব্দে বেবিলোনের স্বাধীনতা লুপ্ত হয় । কিন্তু তখন হইতে জ্যোতিষিক জ্ঞানের আরও উৎকর্ষ হয় । পরবর্তী পারশীক (Acemenids) মেসিডোনীয় গ্রীক (Alexander and Selucids) এবং পার্থীয়ান বংশীয় রাজাদের অধীনে বেবিলোনীয় জ্যোতির্বিদগণ বহু নতুন আবিষ্কার করেন। তাহারাই প্রথমে সৌর ও চন্দ্রমাসের সামঞ্জস্য সাধনের জন্য ৩৮৩ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে প্রথম ১৯ মাসে ৭ টি অধিমাস গণনার প্রণালী প্রবর্তিত করেন (Metonic Cycle)। বেবিলোনবাসী Kidinnu প্রায় ৪০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে প্রথম অয়নচলন (Procession of equinoxes) আবিষ্কার করেন। Babylon এ আবিষ্কৃত জ্ঞান ক্রমে পশ্চিমে গ্রীস দেশে , পূর্বে পারশ্যের ভিতর দিয়া ভারতে ও চীন পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। অনেক জ্যোতিষিক আবিষ্কার যাহাকে পূর্বে গ্রীস দেশ হইতে লব্ধ মনে করা হইত , বর্তমানে দেখা যাইতেছে যে তাহার উৎপত্তি বাস্তবিকই Babylon এ । এই জ্যোতিষিরা সাধারণত Chaldean নামে পরিচিত। এ দেশেও জ্যোতিষশাস্ত্র মুখ্যত “শাকদ্বীপি” বা “মগ” (Magi) ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক আলোচিত হয় এবং নামদৃষ্টেই প্রমাণ শাকদ্বীপি ব্রাহ্মণগণ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়া হইতে সমাগত। ইহাদের ভারতাগমন সম্বন্ধে কৌতূহলকর কাহিনী প্রচলিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহার উল্লেখ হইল না।

সুতরাং দেখা যায় যে, ৫৫০ খ্রিস্ট অব্দে যে পাঁচ খানি সিদ্ধান্ত প্রচলিত ছিল তন্মধ্যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য ঋষিদিগের নিজস্ব ছিল মাত্র পৈতামহ, পিতামহ ব্রহ্মা প্রণীত বলিয়া খ্যাত। কিন্তু বরাহমিহির পিতামহ ব্রহ্মাকে ভাল কালজ্ঞানজ্ঞ বলিয়া Certificate দেন নাই, বরঞ্চ ৮০ খ্রিস্ট অব্দে পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিষের জ্ঞান সমসাময়িক ইংরাজ কৃষকদের জ্যোতিষ জ্ঞান হইতে বিশেষ উন্নত স্তরের ছিল না ইহা বেশ জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

এই ভারতীয় নিজস্ব জ্যোতিষ যাহা ১৪০০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দ হইতে শককাল (৮০ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত প্রচলিত ছিল, তাহা কত অশুদ্ধ যে একটি সামান্য দৃষ্টান্তেই বোঝা যাইবে। এই সিদ্ধান্তমতে ৩৬৬ দিনে বৎসর হয় অর্থাৎ বৎসর গণনায় পিতামহ ব্রহ্মা ১৮ ঘন্টা ভুল করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহার বহু পূর্বেই অর্থাৎ খ্রিস্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতেই Egyptian , Babylonian এবং কিছু পরে Greek ও Roman গণ প্রায় ৩৬৫ ১/৪ দিনে যে বৎসর হয় তাহা জানিতেন। প্রথম খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পঞ্চবৎসরাত্মক যুগগণনা প্রথা এবং পাঁচ বৎসরে দুই অধিমাস গণনার প্রথা প্রচলিত ছিল – তাহাতে পাঁচ বৎসরে প্রায় ৩ ৩/৪ দিনের ভুল হইত। অথচ ৪০০ খ্রিস্ট পূর্ব অব্দে বেবিলোনে যে অধিমাস গণনা প্রণালী প্রচলিত ছিল তাহাতে উনিশ বৎসরে ২ ১/৬ ঘন্টার ভুল হইত। সুতরাং ইহা আশ্চর্যের বিষয় নয় যে ৮০ খ্রিস্ট

অব্দ ও ৪০০ খ্রিস্ট অব্দের মধ্যে হিন্দু পণ্ডিতেরা পিতামহ ব্রহ্মার Authority সত্ত্বেও প্রাচীন গণনাক্রম পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক, রোমান ও Chaldean Astronomy অনুসারে গণনা আরম্ভ করিতে দ্বিধা করেন নাই। এই সময়ের পরে ভারতীয় জ্যোতিষের সম্যক উন্নতি হয় এবং ইহাই দীক্ষিতের "সিদ্ধান্তযুগ"। কিন্তু যদিও সিদ্ধান্তজ্যোতিষ পিতামহ ব্রহ্মার জ্যোতিষ হইতে অনেক উন্নত স্তরের , উহাকে Galileo র সমসাময়িক European জ্যোতিষের সমতুল্য মনে করা প্রলাপ বই কিছুই নয়। কারণ বলিতেছি-

এখন সমালোচক কর্তৃক উদ্ধৃত পুরাণ বচনের আলোচনা করা যাউক।প্রথমে দেখিতে হইবে যে পুরাণগুলি কোন সময়ের রচনা। পুরাণগুলি মহাভারতের পরবর্তীকালে লিখিত , একথা সম্ভবত সমালোচক স্বীকার করিবেন। না করিলেও প্রমাণ দেওয়া কষ্টকর হইবে না। আমি ধরিয়া নিতেছি যে তিনি উহা স্বীকার করেন।

প্রায় সমস্ত পুরাণেই ভবিষ্য রাজবংশের বর্ণনাকালে অন্ধ্রদের বা আন্ধ্র ভৃত্য রাজাদের কথা আছে। তাহাদের প্রাদুর্ভাব কাল ৩১৯ খ্রিস্ট অব্দ। সুতরাং বলিলে ভুল হইবে না যে প্রাচীন পুরাণগুলি ১০০ খ্রিস্ট অব্দ হইতে ৪০০ খ্রিস্ট অব্দের মধ্যে বা পরে সংকলিত হইয়াছিল। এই সমস্ত

পুরাণে যে সমস্ত জ্যোতিষিক বর্ণনা আছে , তাহাতেও দেখা যায় তাহারা সিদ্ধান্ত যুগের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক বেদাঙ্গ জ্যোতিষের পরবর্তী। পূর্বেই বলা হইয়াছে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ ৮০ খ্রিস্ট অব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল।

এখন হিন্দু জ্যোতিষের তথাকথিত উৎকর্ষতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। (1)

পুরাণকার বলিয়াছেন যে-

সর্ব্বগ্রহণামামেতেষামাদিরাদিত্যরুচ্যতে

এর অর্থ যে এই সমস্ত গ্রহের আদি আদিত্য অর্থাৎ সূর্য। কিন্তু পৃথিবী যে গ্রহ তাহা পুরাণকার কোথায় বলিয়াছেন? হয়ত এই বাক্যে বলা হইয়াছে যে সূর্য অপর পাঁচটি (মঙ্গল, বুধ , বৃহস্পতি, শুক্র, শনির) কেন্দ্রস্থানীয়। কিন্তু তাহাই বা কোথায় স্পষ্ট বলা হইয়াছে?

ইউরোপে 'গ্যালিলিও' (১৫৬৪-১৬৪২) যে সর্বপ্রথমে পৃথিবী চলমান বলিয়াছেন, সমালোচক এই তথ্য কোথায় পাইলেন? তিনি বোধ হয় অবগত নহেন যে প্রথম Anaximander of Sparta প্রায় ৫৬০ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে পৃথিবীর আবর্তনবাদ প্রচার করেন। হয়ত এই বাদ তাহার বহু পূর্বেও প্রচলিত ছিল কিন্তু সেরূপ কল্পনারও কিছু

দরকার নাই। মোটের উপর পুরাণকার যদি উক্ত উদ্ধৃত বাক্যে পৃথিবীর আবর্তন বাদ বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি তাহার প্রায় ৮০০ বৎসরের পূর্ববর্তী গ্রীক পণ্ডিতদের মতবাদের প্রতিধ্বনি করিতেছেন মাত্র। লেখকের ভ্রান্তি নিরসনের জন্য এই বিষয়ের আরও বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

পৃথিবীর গতি সম্বন্ধে তিনটি বিষয়ের পর পর ধারণা করিতে হইবে- প্রথমে পৃথিবীর গোলত্ব ও নিরাধারত্ব; দ্বিতীয়ত নিজের মেরু রেখার চতুর্দিকে পৃথিবীর আবর্তন- যাহাতে দিনরাত্রি হয়। তৃতীয়ত সূর্যের চতুর্দিকে বার্ষিক প্রদক্ষিণ। প্রাচীন গ্রীসদেশে এই তিনটি বাদের কি রকম ভাবে পর পর উৎপত্তি হয়, তাহার সময়ানুযায়ী বিবরণ দেওয়া যাইতেছে ।

Anaximander of Sparta 500 B.C.

ইনি গ্রীসদেশে প্রথমে, পৃথিবী যে নিজের মেরুরেখার চতুর্দিকে আবর্তন করিতেছে এবং তজ্জন্য দিবারাত্র হয় এই মত প্রচার করেন।

Eratosthenes of Alexandria 276-195B.C.

ইনি প্রথমে পৃথিবীর ব্যাস মাপেন। তাহার দেওয়া পরিমাণ বর্তমানে জানা পরিমাণ অপেক্ষা বিশেষ তফাৎ নয়। পৃথিবী যে গোল এই মত বোধ হয়, আরও ঢের প্রাচীনকালেও পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

Aristarchus of Samos 275 B.C.

ইনি প্রথম প্রচার করেন সে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে নিজ নিজ ‘কক্ষে ভ্রমণ করে। (২)

কিন্তু এই সমস্ত মত পাশ্চাত্যে গৃহীত হয় নাই। প্রায় ১৬০ খৃঃ অব্দে প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত Klaulius Ptolemy আলেকজান্দ্রিয়া নগরে প্রসিদ্ধ ‘Syntaxis’ গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুস্তকে তিনি পৃথিবীর গোলত্ব অস্বীকার করেন নাই, পরন্তু বর্তমান ভৌগোলিকগণ যেরূপ অক্ষরেক্ষা ও দ্রাঘিমা দ্বারা পৃথিবীর উপর কোন স্থানের অবস্থান নির্ণয় করেন তিনিও সেইরূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু Ptolemy পৃথিবীর আবর্তনবাদ ও Aristarchus of Samos পরিকল্পিত সৌরজগতের সৌর কৈন্দ্রিকতা অথবা Heliocentric Theory of the Solar system মানেন নাই। প্রধানতঃ Ptolemy’র বিরুদ্ধতায় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপে Aristarchus এর মত ত্যক্ত হয়।

প্রায় তেরশত বৎসর পরে ১৪৪৪ খৃঃ অব্দে Poland দেশীয় সন্ন্যাসী Copernicus পুনরায় এই মতবাদ প্রচার করেন যে পৃথিবী ও অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে ভ্রমণ করে এবং সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে নিশ্চল হইয়া বর্তমান থাকে। (৩)।

কিন্তু Copernicus প্রবর্তিত মতও তৎকালীন ইউরোপে গৃহীত হয় নাই। শুধু যে 'পাদ্রীরা এই মতের পরিপন্থী হন তাহা নয়, Tycho Brahe র মত , প্রসিদ্ধ জ্যোতিষজ্ঞ পণ্ডিত এই মত মানিতেন না।

Tycho বলিতেন পৃথিবী বিশ্বজগতের কেন্দ্রে স্থির আছে এবং সূর্য্য ইহার চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং অপরাপর গ্রহ সূর্যের চতুর্দিকে ঘুরিতেছে। Tycho Braheর মত সুবিখ্যাত জ্যোতিষী বৈজ্ঞানিক কারণেই Copernicusএর মতবাদ অস্বীকার করেন এবং এই মতবাদ ইউরোপেও সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হইত, যদি Kepler না জন্মিতেন। Kepler গ্রহগতি সম্বন্ধে তাহার সুপরিচিত তিনটী নিয়ম আবিষ্কার করিয়া সৌরজগতের 'পৃথিবী কেন্দ্রিকতা' বাদকে চিরকালের জন্য সমাধিস্থ করেন। তৎপর Gulileo গতিতত্ত্ব ও Newton (1742-1727) মাধ্যাকর্ষণশক্তি আবিষ্কার করেন এবং Newton উভয়তত্ত্ব প্রয়োগ করিয়া গ্রহগণের গতির সম্যক ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

এখন সমালোচকের হিন্দু জ্যোতিষের উৎকর্ষের দাবী কতটা বিচারসহ তাহা আলোচনা করিয়া দেখাইতেছি। প্রথমেই দেখিয়াছি যে 'পৈতামহ সিদ্ধান্তের কাল অর্থাৎ খৃঃ অব্দের ৮০ সন পর্যন্ত ভারতীয় নিজস্ব জ্যোতিষ বা কালগণনা প্রণালী অতিশয় অশুদ্ধ ছিল এবং তৎপূর্ববর্তী মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে কুত্রাপি পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্তনবাদ ও সূর্যের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণবাদ স্বীকৃত হয় নাই। আনুমাণিক ১০০ খৃঃ অব্দের পরে বোধহয় উজ্জয়িনীর শক রাজাদের সময় হইতে (যাহার পারশিক প্রভাবান্বিত ছিলেন। পাশ্চাত্য (Chaldean ও Greek জ্যোতিষ ভারতে আসিতে আরম্ভ করে। তখন ভারতীয় জ্যোতিষিকগণ পৃথিবীর গোলত্ব, আবর্তনবাদ ইত্যাদি স্থূলভাবে স্বীকার করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু এই মতবাদ যখন বেবিলোনে ও গ্রীসদেশে প্রায় ভারতের প্রথম প্রচলিত মতের অন্যূন তিনশত

বর্ষ পূর্বেই প্রচলিত ছিল এবং যখন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে যে গ্রীক জ্যোতিষ সেই সময় ভারতে সম্যক প্রচারিত হইয়াছিল, তখন স্বীকার করিতে হইবে যে পৃথিবীর গোলত্ব, নিরাধারত্ব, আবর্তন ও প্রদক্ষিণবাদ সম্বন্ধে যদি কিছু পরবর্তীকালের হিন্দুপুরাণে বা জ্যোতিষে থাকে, তাহা

বিদেশ হইতে ধার করা।পৃথিবীর গোলত্ব হিন্দু পণ্ডিতগণ চিরকালই স্বীকার করিয়াছেন, যদিও তাহাদের দেওয়া পৃথিবীর ব্যাস গ্রীকদের দেওয়া পরিমাণ হইতে বিশুদ্ধতর নয়। ভুভ্রমণবাদ সম্বন্ধে প্রথম প্রামাণ্য উক্তি পাওয়া যায় কসুমপুর অর্থাৎ পাটলীপুত্র নিবাসী আর্যভটের (জন্ম ৪৭৬ খৃঃ অব্দ) রচিত গীতিকাপাদে।

“অনুলোমগতির্নৌস্থঃ পশ্চাত্যচলং বিলোমগং নদবত্

অচলানি ভানি তদবৎ সমপশ্চিমগানি লঙ্কায়াম্ —“

ইহা পৃথিবীর আবর্তন সম্বন্ধীয় মতবাদ, কোন প্রাচীন হিন্দু জ্যোতিষী সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ সম্বন্ধে কোনওরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন কিনা তাহা আমার জানা নাই। আর্যভট্ট নিজে Epicyclic Theory দিয়া গ্রহগণের গতি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন—তাহাতে পৃথিবীকে সৌরজগতের কেন্দ্র বলিয়া ধরা হইয়াছে।

কিন্তু আর্যভটের ভুভ্রমণবাদ পরবর্তী কোন হিন্দু জ্যোতিষী গ্রহণ করেন নাই। ব্রহ্মগুপ্ত, লল্ল, মুঞ্জাল, ভাস্করাচার্য প্রভৃতি পরবর্তীকালের সমস্ত খ্যাতনামা জ্যোতিষীই ভুভ্রমণবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। (বিশদভাবে শ্রীযুক্ত

যোগেশচন্দ্র রায়কৃত আমাদের জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ইউরোপে প্রাচীন গ্রীকদের ভুভ্রমণবাদের যে দশা হইয়াছিল, ভারতেও আর্যভটের ভূভ্রমণবাদেরও (যাহা সম্ভবত গ্রীকদের নিকট হইতে ধার করা) সেই অবস্থা হয়। ভূভমণবাদে আর্য ভট্ট পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন মাত্র বুঝিয়াছেন, তিনি অথবা কোন ভারতীয় পণ্ডিত যে পৃথিবী সূর্যের চতুর্দিকে প্রমণ করিতেছে, এই মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। আর্য ভট্টকে তর্কের খাতিরে Copernicusর সমতুল্য ধরিলেও এদেশে পরবর্তীকালে Kepler, Galileo, Newton এর জন্ম হয় নাই, একথা নিশ্চিত বলা যাইতে পারে।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষকালে (৪০০-১১০০ খৃঃ অব্দ) ভারতে কালগণনার অনেক উন্নতি সাধন হয়। বৎসর ও মাসের পরিমাণ, গ্রহদিগের ভগণকাল হিন্দুপণ্ডিতেরা অধিকতর শুদ্ধভাবে নিরুপণ করেন। জ্যোতিষিক গবেষণা করিতে যাইয়া, তাহারা জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, বীজগণিতে অনেক মৌলিক আবিষ্কার করেন। কিন্তু এ সমস্ত আবিষ্কার Pre-renaissance যুগের ইউরোপীয় জ্যোতিষের সমতুল্য– এমন কি কোন কোন অংশে মধ্যযুগের আরব জ্যোতিষেরও সমতুল্য নয়। হিন্দু, ও গ্রীকদের নিকট জ্যোতিষশাস্ত্র শিখিয়া মধ্যযুগের আরবগণ (৭০০:১৫০০ খৃঃ অব্দ)

জ্যোতিষে বহু উন্নতি সাধন করেন। প্রায় ১৭৩০ খৃঃ অব্দে সম্রাট মহম্মদ শাহের আদেশে জয়পুররাজ সবাই জয়সিংহ ভারতে উন্নততর আরব জ্যোতিষের প্রচলন করিতে চেষ্টা করেন। তাহার আদেশে তৈলঙ্গ পণ্ডিত জগন্নাথ সংস্কৃত ভাষায় 'সিদ্ধান্তসম্রাট' নামক গ্রন্থ রচনা করেন, উঃ Ptolemyর Syntatisএর আরব্য সংস্করণের অনুবাদ মাত্র। তার প্রতিষ্ঠিত মাননন্দিরসমূহ মধ্য এশিয়া উলুবেগের মানমন্দিরের আদর্শে গঠিত।

জয়পুররাজ প্রাচীন ভারতীয় সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ পরিত্যাগ করিয়া আরব্য জ্যোতিষের প্রবর্তন করিতে সচেষ্ট হন কেন? কারণ, সিদ্ধান্ত জ্যোতিষের গণনাপ্রণালী ৪০০ খৃঃ অব্দের পক্ষে প্রশংসনীয় হইলেও সম্পূর্ণ শুদ্ধ ছিল না এবং প্রায় ১৩০০ বৎসরের গতানুগতিকতার ফলে, উহা সম্পূর্ণ "দূরবিভ্রষ্ট" হইয়া পড়িয়াছিল। সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ কালের হিন্দু পণ্ডিতগণ মনে করিতেন যে অয়নচলন ক্রমান্বয়ে একদিকে নয়, খানিকদূর যাইয়া পেণ্ডুলামের গতির মত প্রত্যাবর্তন করিবে। সেই জন্য তাহার সায়ন বৎসর (Tropical) গণনা না করিয়া নিয়ে বর্ষ (Sidereal) গণনা করিতেন এবং এখনও করেন। এই জন্য এবং নিয়ন বৎসরের পরিমাণে যে ভুল ছিল দুই এ মিলিযা তাহাদের বৎসরমান প্রকৃত সায়ন বর্ষ মান অপেক্ষা প্রায় .০১৬ দিন বেশী হয় এবং প্রায় ১৪০০ বৎসরে হিন্দু বর্ষ মানে ভুল

প্রায় ২৩ দিনে পৌছিয়াছিল। হিন্দু পঞ্জিকায় ৩১শে চৈত্রকে মহাবিষুব সংক্রান্তি বলা হয়, কিন্তু বাস্তবিক মহাবিষুব সংক্রান্তি হয় ৭ই কি ৮ই চৈত্র। যদিও পৃথদক স্বামী প্রায় ৮৫০ খৃঃ অব্দে স্পষ্ট করিয়া বলেন যে অয়নচলন একদিকেই হয়, তথাপি একাল পর্যন্ত দুই একজন ব্যতীত কোন হিন্দু জ্যোতিষীই বর্ষমানের সংস্কারের আবশ্যকতা উপলব্ধি করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে ১২০০ খৃ: অব্দের পর হইতে হিন্দ জ্যোতিষিক পণ্ডিতগণ বেহুলার মত মৃত সভ্যতার শব আলিঙ্গন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন এবং বর্তমান সময় পর্যন্ত অতি ভুল পদ্ধতিতে বর্ষ গণনা করিতেছেন। মৎ-সম্পাদিত 'Science and Culture' পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটা প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিতেছি যে হিন্দুর তিথি ইত্যাদি গণনা, শুভ অশুভ দিনের মতবাদ, কতকগুলি মধ্যযুগীয় ভ্রান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রচলিত হিন্দুপঞ্জিকা একটা কুসংস্কারের বিশ্বকোষ মাত্র।

সিদ্ধান্ত জ্যোতিষ সম্বন্ধে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় জ্ঞানের কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইল। আশা করি সমালোচক আমার বিবরণে ভূল বাহির করিবেন, না হয় তাঁহার হিন্দুজ্যোতিষের উৎকর্ষ সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি প্রত্যাহার করিবেন। সম্যক অধ্যয়ন ও বিচার না করিয়া অতীতের উপর একটা কাল্পনিক শ্রেষ্ঠত্ব আরোপ করা শুধু

আত্মপ্রবঞ্চন মাত্র এবং এরূপ 'আত্মপ্রবঞ্চকের পক্ষে পরকে উপদেশ দিতে যাওয়া অমার্জনীয় ধৃষ্টতা।

সমালোচক পুনরায় বলিয়াছেন "এই বিশ্বজগতের পশ্চাতে এক বিরাট চৈতন্যশক্তি আছে, তাহা হইলে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহাদির পশ্চাতেও সে শক্তি রহিয়াছে, অতএব এই সকলকে দেবতা বলিলে ভুল হয় না।" এই মন্তব্য বিশ্বাসের কথা, যুক্তির কথা নয়। যাহারা। Shamanismএ বিশ্বাস করেন, তাহারা সমালোচকের মত মানিয়া লইতে পারেন। আমি যুক্তিবাদী, যুক্তি মানিতে রাজী আছি, Shamanism মানিতে আমার কোনও আগ্রহ নাই। এইরূপ বিশ্বাস যদি সভ্যতার উৎকর্ষ প্রতিপন্ন করে, তাহা হইলে Mexico নিবাসী Aztecগণের মত সভ্যজাতি পৃথিবীতে জন্মে নাই, কারণ তাহারা সূর্যকে দেবতা বলিয়া মানিত এবং মনে করিত, যে পর্বে পর্বে নরবলি না দিলে সূর্যের ক্ষুধা মিটিবে না, সূর্যের শক্তি হ্রাস হইবে এবং তাপ বিকীরণের ক্ষমতা লোপ পাইবে, পৃথিবীতে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী আরম্ভ হইবে। সুতরাং পূর্বে পর্বে তাহারা সূর্যের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য সহস্র সহস্র নরবলি দিত।

সূর্য্যকে দেবতা মনে করা একটা প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধারণা মাত্র, এই যুগে সেই ধারণার কোন সার্থকতা নাই। এখন অতি সাধারণ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকেও জানে যে সূর্য পূজা

করিলে গ্রীষ্মের আধিক্য বা অনাবৃষ্টি ইত্যাদি দূরীভূত হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রসাদে সূর্যের উত্তাপকে যন্ত্রযোগে সর্ববিধ কাজে লাগান সম্ভবপর এবং উহাতে মানুষের সর্ববিধ সুবিধা, যেমন শক্তি উৎপাদন refriegeration (শৈত্যোৎপাদন) air-conditioning, cooking, (রন্ধন), water-raising (জলেত্তোলন) ইত্যাদি যাবতীয় প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন হয়। সুতরাং যাহারা সমালোচকের মত গ্রহাদিকে দেবতাজ্ঞান করেন, তাহারা শুধু একটী মধ্যযুগীয় কুসংস্কারের মোহে নিমজ্জিত আছেন, তাহাদের অপেক্ষা যাহারা যন্ত্রযোগে সূর্যের উত্তাপকে সর্ববিধ কাজে লাগাইতে সচেষ্ট আছেন, তাহারা অনেক উন্নতস্তরের জীব। বিশ্বজগতের পশ্চাতে চৈতন্যই থাকুন বা অচৈতন্যই থাকুন, তাহাতে মানবসমাজের কি আসে যায়, যদি সে "চৈতন্য" কোনও ঘটনা নিয়ন্ত্রণ না করেন অথবা কোনও প্রকারে সেই 'চৈতন্যকে আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের অনুকূলে চালিত না করিতে পারি ? প্রাচীন Chalden জ্যোতিষীরা মনে করিতেন যে গ্রহগুলি দেবতার প্রতীক এবং সেই দেবতারা মানবের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করে ; এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা ফলিত জ্যোতিষ বা হোরাশাস্ত্র উদ্ভাবন করেন এবং কোষ্ঠী, গ্রহনক্ষত্রের অবস্থানজনিত ফলাফল গণনা করিতেন। ভারতে বৌদ্ধদের বাধা সত্ত্বেও তাহার উপর গ্রহপূজা আরম্ভ হয়। কিন্তু Chadean সভ্যতার ধ্বংস ও ভারতীয় সভ্যতার অধঃপতন হইতে মনে হয় যে ফলিতজ্যোতিষ সম্পূর্ণ নিরর্থক। বর্তমান

বিজ্ঞানে ফলিত জ্যোতিষের কোন সার্থকতা উপলব্ধি হয় না।

‘ বিজ্ঞানের নামে অজ্ঞানের প্রচার ‘

অধ্যাপক শ্রীমেঘনাদ সাহা ডি-এস-সই, এফ-আর-এস

(মেঘনাদ সাহার এই লেখাটি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।)

একথা না বলিলেও চলে যে, আধুনিক জগতে নানা কারণে বিজ্ঞানের বেশ খানিকটা মর্যাদা বা prestige বাড়িয়াছে। য়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে বিজ্ঞানের দৌলতে গত পঞ্চাশ বৎসরে মানবের জীবনযাত্রার প্রণালী অনেক পরিমাণে উন্নত হইয়াছে; এবং জ্যোতিষ, প্রাকৃত বিজ্ঞান, রসায়ন, প্রাণি ও উদ্ভিদ তত্ত্ব, চিকিৎসা শাস্ত্র, যন্ত্রবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে মানবের জ্ঞানের পরিধি অপরিসীম বাড়াইয়া দিয়াছে। সুতরাং ইহা কি আশ্চর্যের বিষয় নয়

যে, অনেক অ-বৈজ্ঞানিক লোক (অর্থাৎ যাহারা কখনও বিজ্ঞানের ধারাবাহিক শিক্ষার—discipline of science—ভিতর দিয়া যান নাই, অতএব যাহাদের বর্তমান বিজ্ঞান, সম্বন্ধে জ্ঞান নাই বলিলেও চলে) ...নানা প্রকারে বিজ্ঞানের বাস্তব কৃতিত্বকে খর্ব করিতে প্রয়াস পাইবেন?

এই প্রচেষ্টা প্রকাশ পাইতেছে নানা রূপ ধরিয়া। এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, বিজ্ঞান আর নূতন কি করিয়াছে ? বিজ্ঞান বর্তমানে যাহা করিয়াছে—তাহা কোনও প্রাচীন ঋষি, বেদ বা পুরাণ বা অন্যত্র কোথাও-না-কোথাও বীজাকারে বলিয়া গিয়াছেন। অপর এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, বিজ্ঞান মানব-সমাজের ইষ্ট অপেক্ষা অনিষ্টই অধিক করিয়াছে, যথা—বিজ্ঞানের প্রসারে মানব-সমাজে যুদ্ধ-বিগ্রহ বাড়িয়াছে, বিষাক্ত গ্যাস, বিস্ফোটক প্রভৃতি নানারূপ মানুষ-মারা জিনিস সৃষ্টি হইয়াছে। অপর এক শ্রেণীর লোক বলেন যে, বিজ্ঞান মানুষের ভোগলিপ্সা বর্ধিত করিয়া তাহাকে আধ্যাত্মিকতা হইতে ভিন্ন পথে লইয়া যাইতেছে। সমালোচক অনিলবরণ রায়ের রচনার মধ্যে এই ‘ত্রিবিধ’ মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি পূর্ববর্তী প্রবন্ধদ্বয়ে প্রথম শ্রেণীর সমালোচকদের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছি। সমালোচক অনিলবণ রায় বর্তমান বিজ্ঞানের যে সমুদয় তথ্য, যেমন—“ক্রমবিবর্তনবাদ, ‘জ্যোতিষ্ক আবিষ্কার’ ইত্যাদি—প্রাচীন শাস্ত্রে কোথাও না কোথাও বীজাকারে বা পূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই যে ‘অলীক ও ভ্রান্ত তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। এক্ষণে বক্তব্য, সমালোচক যদি বাস্তবিকই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের

সহিত প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের তুলনামূলক আলোচনা-কার্য্যে ব্রতী হইতে চান, তবে তিনি ভাল করিয়া ‘পাশ্চাত্য বিজ্ঞান’-এর সাধনা করুন, নতুবা ‘অজ্ঞানকে বিজ্ঞান বলিয়া প্রচারের অপচেষ্টা করা নিরর্থক এবং আমার মতে তাহার কোন অধিকার নাই। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান অতি বিরাট জিনিস-প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত শাস্ত্র ; ধ্যানে বসিয়া অথবা দুই-একখানা সুলভ বা popular বই পড়িয়া তাহাতে অধিকারী হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ঐ বিজ্ঞানের সাধনা করিতে হয় হাতে-কলমে, প্রণিধান করিতে হয় আজীবন স্বাধীন চিন্তায়, ‘গুরু’ বিজ্ঞানে ‘পথপ্রদর্শক মাত্র, কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিক গুরু যদি ‘পূর্ণ ও চিরন্তন সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন বলিয়া দাবী করেন, তাঁহাকে উপহাসাস্পদ হইতে হইবে। এক্ষেত্রে গুরুভক্তদের চেয়ে গুরুমারা’ শিষ্যেরই আদর ও প্রয়োজনীয়তা বেশী। বিজ্ঞান কখনও চিরন্তন সত্য আবিষ্কার করিয়াছে বলিয়া দাবী করে না, কিন্তু সাধকের অনুসন্ধিৎসা-বৃত্তিকে সজাগ রাখিয়া তথ্য সন্ধানের পন্থা বলিয়া দেয়।

বিজ্ঞানের নামে সমালোচকের দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে তাহার অন্তর্নিহিত পাশবিক ভাবকে জয় করিতে পারে নাই। সমালোচক অনিলবরণ রায় বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই মামুলী অভিযোগ আনিতে ছাড়েন নাই এবং অনেক গান্ধী-পন্থীও

'বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থাপিত করিয়া চরকা, গরুর গাড়ী ও বৈদিক তাতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন।

কিন্তু এই সমস্ত সমালোচক একটা অতি স্থূল কথা ভুলিয়া যান। বিজ্ঞান যে ব্যক্তিগত জীবন'-কে কতটা উন্নত করিয়াছে তৎসম্বন্ধে তাহাদের মোটেই কোন ধারণা নাই। দুই একটি প্রমাণ দিতেছি।

আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর যে সমস্ত দেশে বিজ্ঞান ব্যক্তিগত জীবনে প্রযুক্ত হয় নাই, তথায় মানুষের গড়পড়তায় জীবনকাল সাড়ে তেইশ বৎসর মাত্র। মধ্যযুগে অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক যুগের পূর্বে, য়ুরোপেও গড় জীবনকাল ছিল পঁচিশ বৎসর। কিন্তু গত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে য়ুরোপ ও আমেরিকায় মানুষের গড়পড়তায় জীবন বাড়িয়া প্রায় দুই গুণ অর্থাৎ প্রায় ছচল্লিশ বৎসর হইয়াছে। 'বর্তমান বিজ্ঞান'-এর ভারতীয় সমালোচকগণ এই জীবনবৃদ্ধির কারণটা তলাইয়া দেখিবার বোধ হয় অবসর এ পান নাই। ইহার কারণ এই যে, বিজ্ঞানের প্রসাদে য়ুরোপের অধিবাসীরা প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্যকর আবাস, রোগের উপযুক্ত চিকিৎসা, যথেষ্ট বিশ্রাম প্রভৃতি স্বাচ্ছন্দ্যের (amenities of life) অধিকারী হইয়াছে। কিন্তু ভারত, চীন বা আবিসিনিয়ার গ্রামবাসী দুইবেলা উপযুক্ত আহার

পায় না, তাহাদের শীত-গ্রীষ্মনিবারক বস্ত্রাদি নাই, বাসস্থান অতীব অস্বাস্থ্যকর, রোগে চিকিৎসক ডাকিবার ও ঔষধ কিনিবার সামর্থ্য নাই ; এ জন্য অধিকাংশ স্থলেই তাহারা অকালে কাল গ্রাসে পতিত হয় এবং যতদিন বাঁচিয়া থাকে বেশীর ভাগ অভাব, রোগ ও শোকগ্রস্ত হইয়া আধমরা হইয়াই থাকে।

জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি হিসাব করিয়া দেখিয়াছে যে, এদেশের লোকের বৎসরে মাথা পিছু আয় পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র, কিন্তু বিলাতের লোকের আয় প্রায় মাথা পিছু দুই হাজার টাকা, অর্থাৎ—এখানকার প্রায় ত্রিশ গুণ। অনেকে বিলাতের সহিত তুলনায় আপত্তি করিবেন, কারণ বিলাতের উপনিবেশ আছে, আর আছে ভারত-মাতারূপ একটি কামধেনু। কিন্তু আর একটি পাশ্চাত্য দেশ লওয়া যাক, যেমন সুইডেন। এই দেশের কোন উপনিবেশ বা অধীন দেশরূপ কামধেনু নাই; তাহা সত্ত্বেও এই দেশের জনপ্রতি বাৎসরিক আয় ভারতবাসীর গড় আয়ের প্রায় বিশ গুণ। এমন কি, জাপান ভারত অপেক্ষা প্রাকৃতিক সম্পদে ন্যূন হইলেও বিজ্ঞান-সম্মত কার্য্য-পন্থা অবলম্বন করায় তথায় জনপ্রতি আয় গত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে ভারতবাসীর আয় অপেক্ষা চারি হইতে পাঁচ গুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

চীন, ভারত ও আবিসিনিয়ার দারিদ্রের একমাত্র কারণ এই যে, এই সমস্ত দেশ (যে কারণেই হউক আংশিক পরাধীনতা, আংশিক ভ্রান্ত জনমত পোষণ) , বিজ্ঞানকে গ্রহণ করে নাই এবং বৈজ্ঞানিক-প্রণালী অবলম্বনে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি করিবার এবং জনসাধারণের মধ্যে সেই সম্পদ যথাসম্ভব সমভাবে বিতরণ করিবার চেষ্টা করে নাই। পক্ষান্তরে, ইংলণ্ড ও অপরাপর যুরোপীয় দেশ নিজ নিজ যাবতীয় প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে নিযুক্ত করিয়া বৎসরে জনপিছু প্রায় দুই হাজার ইউনিট কাজ পাইতেছে ; কিন্তু ভারতবাসী মোটের উপর নিজের শক্তি এবং দুই একটি গৃহপালিত পশুর শক্তির উপর নির্ভর করে বলিয়া তাহার আয়ও পঁচিশ হইতে ত্রিশ গুণ কম হয়। একজন চরকাপন্থী বর্তমান লেখককে জানাইয়াছেন যে, তাহাদের বহুবর্ষব্যাপী অভিজ্ঞতার ফলে দাড়াইয়াছে এই যে, সারা বৎসর বিশ্রাম সময়ে চরকা কাটিয়া সাকুল্যে.বৎসরে আয় হয় মাত্র চারি টাকা। চরকার নিরর্থকতা সম্বন্ধে ইহার চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে, বিজ্ঞানের প্রভাবেই প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাইয়া দেশের আয়বৃদ্ধি করা সম্ভব হইয়াছে ; এবং ব্যক্তিগত জীবনকে মধ্যযুগ (বিজ্ঞানের পূর্ববর্তী যুগ) অপেক্ষা সর্বাংশে উন্নত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করিয়া তোলা সুকর হইয়াছে।

যদি মানুষকে সর্বদা অভাব, অভিযোগ ও দারিদ্রের : সহিত সংগ্রাম করিতে হয় তবে তাহার ইতর প্রাণীজীবনের ঊর্ধে উঠিবার অবসর কোথায়? অধিকাংশ ঐতিহাসিকদিগের মতে যে সমস্ত জাতি বা সমাজ সভ্যতার ঊর্ধ্বতম শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা অপরাপর জাতি বা সমাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। দার্শনিক গুরু প্লেটো বলিয়াছেন যে, এথেন্সের সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগে, অর্থাৎ-পেরিক্লিসের কালে, প্রত্যেক এথেনীয় নাগরিকের গড়ে চারিজন ক্রীতদাস থাকিত ; অর্থাৎ-নাগরিকদের অধীনে এক শ্রেণীর লোক ছিল যাহারা কৃষি, শিল্প, ভারবহন ইত্যাদি যাবতীয় শ্রমসাধ্য কাজ করিত এবং নাগরিকগণ শুধু তাহাদের কার্যপ্রণালী নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করিতেন। এজন্য নাগরিকগণ সুষ্ঠু কাব্য, দর্শন, স্থপতি ও কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান প্রভৃতির আলোচনার জন্য যথেষ্ট সময় পাইতেন। কিন্তু এথেন্স এখন মাকিদন রাষ্ট্রের অধীন হইল তখন এথেন্সবাসী নাগরিকের অর্থ-সমস্যা আরম্ভ হইল এবং যে এথেন্স এককালে সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের সংস্কৃতিপ্রভাবে পৃথিবীকে চমৎকৃত করিয়াছিল তাহা অচিরে, অর্থাৎ এক শতাব্দীর মধ্যে, একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর নগরে পরিণত হইল।

কিন্তু বর্তমান সময়ে, অর্থাৎ প্রগতিশীল বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে নিয়োজিত করিয়া তাহার

যাবতীয় কাজ করাইয়া লইতে পারে, ক্রীতদাস রাখার প্রয়োজন হয় না বললেও চলে। য়ুরোপ ও আমেরিকায় গত পঞ্চাশ বৎসর ধরিয়া এই প্রচেষ্টা চলিতেছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, ইংলণ্ডে বৎসরে জনপিছু কাজের পরিমাণ দুই হাজার ইউনিট—ইহার মধ্যে প্রায় ছয় শত ইউনিট বৈদ্যুতিক শক্তি হইতে, প্রায় হাজার ইউনিট বাষ্পীয় শক্তি হইতে এবং অবশিষ্ট চারিশত ইউনিট পেট্রোল ও অপরাপর দাহ্য পদার্থ হইতে উৎপন্ন করা হয়। যদি উহার সমতুল্য পরিমাণ কাজ ক্রীতদাস রাখিয়া উৎপন্ন করা হইত, তবে ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তির অন্যূন দশজন ক্রীতদাসের প্রয়োজন হইত এবং প্রত্যেক ক্রীতদাসকে প্রত্যহ আট ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইত। কারণ, মানুষের কার্য্যকরী ক্ষমতা অত্যন্ত কম। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে দেখা গিয়াছে যে, একটি ঘোড়া দশজন মানুষের কাজের সমান কাজ করিতে পারে। একটি ঘোড়া এক ঘণ্টা কাজ করিলে ৩/৪ ইউনিট কাজ হয় ; – সুতরাং, একজন লোক আট ঘণ্টা খাটিলে, ত্রৈরাশিক পন্থায় দেখা যাইবে যে, মাত্র ৩*৪/৪*১০ , অর্থাৎ ৩/৫ ইউনিট কাজ করিতে পারে। যদি ধরা যায় যে, ক্রীতদাস বৎসরে তিন শত দিন কাজ করে, তাহা হইলে তাহার সারা বৎসরে কাজের পরিমাণ হয় ৩/৫* ৩০০ অর্থাৎ একশত আশী ইউনিট। অতএব, দুই হাজার ইউনিট কাজ পাইতে হইলে ইংলণ্ডের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রায় এগার জন ক্রীতদাসের প্রয়োজন হইত।

যদি পাঠকগণ এই সহজ হিসাবটি বুঝিতে চেষ্টা করেন তবে দেখিতে পাইবেন যে, আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পক্ষে কতটা সুন্দর পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে বিনিয়োগ করার ফলে প্রতি ইংলণ্ডবাসী কম-বেশ দশটি ক্রীতদাসের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদের অধিকারী হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, এই ‘ক্রীতদাস’কে বাধ্য রাখার জন্য আয়াস স্বীকার করিতে হয় না, কার্যপন্থা সুনির্দিষ্ট করিয়া কেবলমাত্র ‘সুইচ, টিপিবামাত্র ‘ক্রীতদাস’ স্বতস্ফূর্ত্তিতে কাজ করিয়া যায়। বেত্রাঘাতের বালাই নাই, পুলিস বা সিপাহী মোতায়েন রাখিবার আবশ্যকতা নাই। ইংলণ্ড, আমেরিকা ও জাপান এতটা ঋদ্ধিশালী হইয়াছে এই প্রাকৃতিক শক্তি প্রয়োগের ফলেই, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনও অনেক উন্নত স্তরে উঠিয়াছে। এক্ষণে বক্তব্য, যদি এদেশের সুমহান্ অধ্যাত্ম তত্ত্বের সাধকগণ এবং তথা গান্ধী-পন্থিগণ এই সামান্য তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন তবে আমাদের দেশ চরকা, গরুর গাড়ী, বৈদিক তাঁত ও প্রাচীন শাস্ত্রের মারাত্মক আধ্যাত্মিকতার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ভবিষ্যতে মহীয়সী সভ্যতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে। ভারত প্রাকৃতিক সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ; যদি একটি সুচিন্তিত কার্যপ্রণালী স্থির করিয়া দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকে মানুষের সর্ববিধ কার্যে প্রয়োগ করিবার

দেশব্যাপী প্রচেষ্টা হয় তাহা হইলে আশা করা যাইতে পারে যে দশ বৎসরের মধ্যে ভারতের জনপিছু দ্বিগুণ আয় করা কিছু অসম্ভব নয়। জাতীয় পরিকল্পনা সমিতি সম্প্রতি এই কার্যপন্থা নির্ধারণে নিযুক্ত আছেন।

প্রাচীনকালে ও মধ্যযুগে লোকের নিজের দেশ ছাড়া, অন্য দেশ সম্বন্ধে ধারণা অতি অল্পই ছিল, ভিন্নদেশের ও ভিন্ন ধর্মী লোককে তাহারা বর্বর, অসভ্য ও পাপাসক্ত বলিয়া মনে করিত ; এক দেশের লোকের পক্ষে অন্য দেশে ভ্রমণ করা বিপজ্জনক ছিল। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রসাদে পৃথিবীর অতি দুরতম দেশের মধ্যেও সংযোগ স্থাপিত হইয়াছে, বিভিন্ন দেশের লোক পরস্পর পরস্পরকে জানিতে শিখিয়াছে। বিজ্ঞান ব্যক্তিগত জীবনকে যতটা সুখী ও উন্নত করিয়াছে তৎসম্বন্ধে অধিক বলা বাহুল্য মনে করি।

[লেখাটি সংশয়ডটকম থেকে নেওয়া হয়েছে]

| প্রশ্ন করুন এই গুগল ফর্মে – Ask_Rationalists

এমাসে Ask rationalists প্রকাশিত হল না, তারজন্য আন্তরিক ক্ষমাপ্রার্থী

ম্যাগাজিনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ছবিঋণ পিন্টারেস্ট ও ইন্টারনেট মাধ্যম

"নাস্তিক হওয়া সহজ ব্যাপার নয়, এ এক অনন্য শক্তিরই অভিব্যক্তি।

কেন না বিশেষ জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও মনোবল না থাকলে নাস্তিক হওয়া যায় না।

আশৈশব লালিত বিশ্বাস-সংস্কার, আচারআচরণ, রীতিনীতি পরিহার করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়, কেবল অসামান্য নৈতিকশক্তিধর যুক্তিবাদী মানুষের পক্ষেই তা সম্ভব।"

- ড. আহমদ শরীফ

চেতনার অন্বেষণে

মাসে একটি লেখা

মুক্তচিন্তার ওপর লেখালেখি ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে দেখে পত্রিকাটি শুরু করেছিলাম।

আপনারা যারা মুক্তচিন্তা, যুক্তিবাদ, নাস্তিকতার চর্চা করেন যেমন পারবেন, যতটুকু পারবেন লিখুন। ফেসবুক, ব্লগ ইত্যাদি মিডিয়ায় লেখা প্রকাশ করার পাশাপাশি লেখাটি পাঠান।

পত্রিকার অন্যতম লক্ষ্য যুক্তিবাদীদের লেখালেখিতে উৎসাহিত করা, এবং মুক্তচিন্তকদের চিন্তাধারা সমাজে তুলে ধরা।

প্রচলিত অর্থে ম্যাগাজিনের জন্য লেখা বলতে গুরুগম্ভীর, বড়, সাধারণ লেখার থেকে একটু আলাদা, কিংবা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ এরকম বুঝি, কিন্তু আমরা যে ধরনের লেখা চাই তা এরকম হতেই হবে এমন মোটেও নয়। কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা কোন বিষয়ে আপনার চিন্তা-ভাবনা কী সে সম্পর্কে ৫-১০ লাইন লিখলেও পাঠানো যায়। আমরা চাই আপনার লেখনী চলতে থাকুক। লেখায় নিজের পরিচয় গোপণ রাখতে চাইলেও অসুবিধা নেই, আপনার লেখা প্রকাশ করব। যা দুই বাংলার অগনিত মানুষের কাছে আমাদের ভাবনা ছড়িয়ে পড়বে এবং মুক্তচিন্তকদের আরও সংঘবদ্ধ করতে উৎসাহিত করবে।

এমন নয় যে আপনার লেখাটি কোথাও প্রকাশ করেছেন বলে দেওয়া যাবে না, তা একেবারেই নয়। ক্রমশ অসহনীয় রাজনৈতিক দিনগুলিতে যুক্তিবাদীরা কোণঠাসা হচ্ছে। তাদের নিজেদের জন্য হলেও কলম তুলে নিতে হবে এটি নির্মম সত্য। কোন প্রকার প্রশ্ন এবং লেখা পাঠানোর ঠিকানা নীচে দেওয়া রয়েছে। ধন্যবাদ।

ফেব্রুয়ারি সংখ্যা সংগ্রহ করুন

পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক হোন (বিনিময়মূল্য ছাড়াই)

পত্রিকার গ্রাহক হতে ফর্ম পূরণ করুন- Cilck Here | Scan QR

যো গা যো গ

Email: yuktibadira@gmail.com

